সাহিত্য-কণিকা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সাহিত্য-কণিকা

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক

অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. সরকার আবদুল মান্নান

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর

ড. শোয়াইব জিবরান

শামীম জাহান আহসান

প্রথম প্রকাশ	:	অক্টোবর, ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	নভেম্বর, ২০২০
পুনর্মুদ্রণ	:	অক্টোবর, ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

অষ্টম শ্রেণির **সাহিত্য-কণিকা** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর আলোকে প্রণীত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে একদিকে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাক্রম সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদিকে এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এছাড়া এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাকার বিষয়ও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
	গদ্য		
১.	অতিথির স্মৃতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
২.	ভাব ও কাজ	কাজী নজরুল ইসলাম	৭
৩.	পড়ে পাওয়া	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
৪.	তৈলচিত্রের ভূত	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২২
৫.	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	শেখ মুজিবুর রহমান	৩১
৬.	লাইব্রেরি	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৩৭
৭.	সুখী মানুষ	মমতাজউদদীন আহমদ	৪২
৮.	শিল্পকলার নানা দিক	মুস্তাফা মনোয়ার	৪৯
৯.	মংডুর পথে	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	৫৪
১০.	বাংলা নববর্ষ	শামসুজ্জামান খান	৬১
১১.	বাংলা ভাষার জন্মকথা	হুমায়ুন আজাদ	৬৮
১২.	গণঅভ্যুত্থানের কথা	*সংকলিত*	৭৩
	কবিতা		
১	মানবধর্ম	লালন শাহ্	৮০
২.	বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৮৪
৩.	দুই বিঘা জমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৮
৪.	পাছে লোকে কিছু বলে	কামিনী রায়	৯৫
৫.	প্রার্থনা	কায়কোবাদ	৯৯
৬.	বাবুরের মহত্ত্ব	কালিদাস রায়	১০২
৭.	নারী	কাজী নজরুল ইসলাম	১০৮
৮.	আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ	১১৩
৯.	রূপাই	জসীমউদ্‌দীন	১১৭
১০.	নদীর স্বপ্ন	বুদ্ধদেব বসু	১২১
১১.	জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	সুফিয়া কামাল	১২৫
১২.	প্রার্থী	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১২৯
১৩.	একুশের গান	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	১৩৩

অতিথির স্মৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে— পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি— পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থগাছের মাথায়— সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারের ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেত। হঠাৎ কী জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, কেউ ধরলে না তো? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই, পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা— কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের বেশি। প্রথমেই যেত পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম এরা বেরিবেরির আসামি। ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। মোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েছে, তবু দেখি কারও পায়ে আঁট করে মোজা পরা। কেউ বা দেখলাম মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে— সেটা পথ চলার বিঘ্ন, তবু, কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সবচেয়ে দুঃখ হতো আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেত। সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ, মুখ তেমনি পাণ্ডুর— কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই। শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি তার কোলে। সে তো আর হাঁটতে পারে না—

অথচ, ফিরে আসবারও ঠাঁই নেই? কী ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি।

সেদিন সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা হরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। সম্ভবত এরা বাতব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যার পূর্বেই এদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হলো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পেছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পেছনে চলেছে। বললাম, কী রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বুঝলাম সে রাজি আছে। বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে। পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে; কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সমুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল, কিছুতে ভেতরে ঢোকার ভরসা পেল না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হলো, গেট বন্ধ করে দিতে চাইল, বললাম, না, খোলাই থাক। যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘন্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসে নি— কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগল। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,— না খেয়ে যাসনে বুঝলি? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ল— অর্থ বোধ হয় এই যে, সত্যি বলছো তো?

রাত্রে চাকর এসে জানাল সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নিচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায় নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

আমি জানতাম, প্রত্যহ খাবার তো অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির মালিনী— এ আমি জানতাম না। তার বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত। চাকরদের দরদ তার পরেই বেশি। অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ অতিথি, আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে লাগল কেমন? সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালির বউ তারে মেরেধরে বার করে দিয়েছে— বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদেরও তাতে সায় ছিল।

হঠাৎ শরীরটা খারাপ হলো, দিন-দুই নিচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা যেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম। সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম—

খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?

হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কী একটা নালিশ ও জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে, কুকুরটাকে আজ খেতে দিয়েছিস?

আজ্ঞে না। মালি-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।

আজ তো অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হলো কী?

মালি-বৌ চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে।

আমার অতিথিকে ডেকে আনা হলো, আবার সে বারান্দার নিচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল। মালি-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হলো যে।

শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হলো, দুপুরের ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়াল, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কী রে, এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিল, কী জানি মানে তার কী!

টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম— স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, অতিথি আজ ফিরে গেয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ, ঢুকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোনো ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা। হয়তো, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই, তবু দেওঘরে বাসের কটা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

ভজন — ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তুতি বা মহিমাকীর্তন। প্রার্থনামূলক গান।

দোর — দুয়ার বা দরজা। বাড়ির ফটক।

কুঞ্জ — লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃত্তাকার স্থান, উপবন।

বেরিবেরি — বি ভিটামিনের অভাবে হাত-পা ফুলে যাওয়া রোগ।

আসামি — এ শব্দটি দিয়ে সাধারণত আদালতে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে রোগাক্রান্তদের বোঝানো হয়েছে।

পাণ্ডুর — ফ্যাকাশে।

মালি — মালা রচনাকারী, মালাকর। বেতনের বিনিময়ে বাগানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি।

মালিনী — মালির স্ত্রী।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ গল্প পড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। নতুন কোনো জায়গা ভ্রমণ করলে ওই অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেও আগ্রহী হবে।

পাঠ-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং ঈষৎ পরিমার্জনা করে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে। একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কই এ গল্পের বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন, মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক নানা প্রতিকূল কারণে স্থায়ীরূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়। আবার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিক্ত হয় তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে। এ গল্পে সম্পর্কের এই বিচিত্র রূপই প্রকাশ করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় ভাগলপুরের মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি কলেজশিক্ষা শেষ করতে পারেননি। ১৯০৩ সালে জীবিকার সন্ধানে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকালে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একে একে গল্প-উপন্যাস লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখকে পরিণত হন। সাধারণ বাঙালি পাঠকের আবেগকে তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'পল্লীসমাজ', 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' (চার পর্ব), 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি। সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী কথাশিল্পীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার অভিজ্ঞতা থেকে একটি ভ্রমণকাহিনির বিবরণ লেখো (একক কাজ)।

খ. তোমার প্রিয় কোনো পশু বা পাখির কোন কোন আচরণ তোমার কাছে মানুষের আচরণের মতো মনে হয়, তার একটি বর্ণনা দাও (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কখন ঘরে প্রবেশ করে?

ক. সন্ধ্যার পূর্বে   খ. সন্ধ্যার পরে

গ. বিকেল বেলা   ঘ. গোধূলি বেলা

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি পেয়েছেন?

ক. ঢাকা খ. কলকাতা

গ. অক্সফোর্ড ঘ. কেমব্রিজ

৩. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে কী বোঝায়?

i. কোনো তিথি না মেনে কারো আগমনকে

ii. মাত্রাতিরিক্ত সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করাকে

iii. অবাঞ্ছিতভাবে কোনো অতিথির অধিক সময় অবস্থানকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাবা-মায়ের আদরের দুই ছেলে আশিক ও আকাশ এবার ক্লাস টুতে পড়ে। ওদের বাবা একদিন ছোট্ট খাঁচায় একটি ময়না পাখি উপহার দেয়। সেই থেকে সারাক্ষণ দুই ভাই প্রতিযোগিতা করে পাখিটিকে খাবার ও পানি দেওয়া, কথা বলা আর কথা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে দেখে, বিড়াল এসে রাতে পাখিটাকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে তাদের অঝোর ধারায় কান্না, কেউ আর থামাতেই পারে না। আজও সেই ময়নার কথা মনে হলে ওরা কেঁদে ওঠে।

৪. উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক

ii. পশু-পাখির সাথে মানুষের স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক

iii. ভালোবাসায় সিক্ত পশু-পাখির বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

খ. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

গ. অতএব আমার অতিথি উপবাস করে।

ঘ. তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দরিদ্র বর্গাচাষি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ষাঁড় মহেশ। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমত খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে— মহেশ, তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুত্তরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে।

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওঘরে যাওয়ার কারণ কী?

খ. অতিথি কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের গফুরের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন–'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

২. লালমনিরহাটের যুবায়ের প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষাহাতি কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রেতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাঁধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খদ্দের আরও বেশি লোকজন সাথে করে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যুবায়ের দেখে— কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিৎকার করে আর বলে—'ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!'

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পদক লাভ করেন?

খ. লেখক দেওঘর থেকে বিদায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. কালাপাহাড়ের আচরণ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের অতিথির আচরণ কীভাবে ভিন্ন– বর্ণনা করো।

ঘ. 'উদ্দীপকের যুবায়ের এর অনুভূতি আর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত'—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

ভাব ও কাজ

কাজী নজরুল ইসলাম

ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আসলে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ। ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কজায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ-খেয়াল। এই ভাবকে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমাগরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদাচাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম

ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ-কথাটা একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া 'স্পিরিট'কে কী বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে? হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—বাহিরে যতই কেন না-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এই রূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের 'স্পিরিট'টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহাশত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমতো বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কীরূপে বা এমন কাপুরুষের মতো ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁহারা কোনো ভালো কাজে আর কোনো অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজি নন। কী করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কতো লোকের কতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী—সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্মীর কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারারা এখন ভালো বলিতে গেলেও এই সব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাঁধইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এ-সব না ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কী? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। আমরা বলিব, ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন! ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর। 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইও না। অন্ধের মতো কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এ-সব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া

পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভালো করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কী। শুধু উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো দেওয়ালের সঙ্গে পা ঘেঁষড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাহা পাপ— মহাপাপ!

শব্দার্থ ও টীকা

আসমান — আকাশ।

জমিন — মাটি, ভূপৃষ্ঠ।

কব্জায় — আয়ত্তে, অধিকারে।

মশগুল — মগ্ন, বিভোর।

বদ-খেয়াল — খারাপ চিন্তা, খারাপ আচরণ।

দাদ — প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা।

কর্পূর — বৃক্ষরস থেকে তৈরি গন্ধদ্রব্য বিশেষ, যা বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ঋষি — শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী, মুনি, যোগী।

বানভাসি — বন্যায় ভাসানো, বন্যায় যা বা যাদের ভাসিয়ে আনে।

বন্দোবস্ত — ব্যবস্থা, আয়োজন।

অনর্থক — ব্যর্থ, নিষ্ফল, অকারণ।

কুম্ভকর্ণ — রামায়ণে বর্ণিত রাবণের ছোটো ভাইয়ের নাম। সে একনাগাড়ে ছয় মাস ঘুমাত। এখানে যে খুব ঘুমায় বা সহজে যাকে জাগানো যায় না।

হুজুগ — সাময়িক আন্দোলন, জনরব, গুজব।

সঙ্কল্প — প্রতিজ্ঞা, শপথ।

স্পিরিট — ইংরেজি Spirit শব্দটির অর্থ উদ্দীপনা, উৎসাহ, শক্তি। এ প্রবন্ধে 'আত্মার শক্তির পবিত্রতা' অর্থে স্পিরিট শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কল্যকার — পূর্ব বা পরবর্তী দিন। এখানে পূর্বের দিন অর্থে।

লা-পরওয়া — গ্রাহ্য না করা।

দস্তুরমতো — রীতিমতো, যথেষ্ট, নিতান্ত।

সুবর্ণ — সোনা, স্বর্ণ।

পুয়াল — খড়।

দশচক্রে ভগবান ভূত — দশজনের চক্রান্তে সাধুও অসাধু প্রতিপন্ন হতে পারে, বহুলোকের ষড়যন্ত্রে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

কাণ্ডাকাণ্ড — ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ।

উদ্‌মো ষাঁড় — বন্ধনমুক্ত ষাঁড়।

প্ররোচনা — উসকানি, উত্তেজনা সৃষ্টি।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা মহৎ কাজের জন্য অনুপ্রাণিত হবে। শুধু ভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হওয়া নয়, ভাবের সঙ্গে পরিকল্পিত কর্মশক্তি ও বাস্তব উদ্যোগের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে 'যুগবাণী' গ্রন্থ থেকে। ভাব ও কাজের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শুধু ভাব দিয়ে মহৎ কিছু অর্জন করা যায় না। তার জন্য কর্মশক্তি এবং সঠিক উদ্যোগের দরকার হয়। ভাবের দ্বারা মানুষকে জাগিয়ে তোলা যায়, কিন্তু যথাযথ পরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা ছাড়া যে কোনো ভালো উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রচনাটিতে লেখক দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তবধর্মী কর্মে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি

অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প– সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নজরুল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক কবিতা, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান ও গজল লিখেছেন। কবিতা ও গানে বহুল পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে কবিকে বাংলাদেশে আনা হয়।

১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও একুশে পদক পান। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, কাব্যগ্রন্থ : 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক'; উপন্যাস : 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'; গল্পগ্রন্থ : 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' 'শিউলিমালা'; প্রবন্ধগ্রন্থ : 'যুগবাণী', 'রুদ্র-মঙ্গল'; নাটক : 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'মধুমালা' ইত্যাদি। কাজী নজরুল ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'আত্মার শক্তি' বিষয়ে একটি গল্প রচনা কর (একক কাজ)।

খ. একদল 'ভাবে'র পক্ষে এবং আরেক দল 'কাজে'র পক্ষ নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে (দলগত কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ভাব ও কাজ' লেখাটি কোন ধরনের সাহিত্য?

ক. ছোটগল্প খ. প্রবন্ধ

গ. কাহিনী কাব্য ঘ. উপন্যাস

২. "সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়"– বাক্যটির 'কর্পূর' শব্দের অর্থ নিচের কোনটি?

ক. কপালের রেখা

খ. এক ধরনের পাখি বিশেষ

গ. বাতাসের সংস্পর্শে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এমন বস্তু

ঘ. বাতাসের সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন বস্তু

৩. 'ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না।' জ্ঞান হারালে–

i. দেশের পতন হবে

ii. নিজের পতন হবে

iii. মনুষ্যত্বের পতন হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

জুয়েল ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। সে ক্লাসে সবসময় চুপচাপ থাকে। দেখলে মনে হয় কী যেন চিন্তা করছে। ক্লাসের পড়াও ঠিকমত শেখে না। কিন্তু তার স্বপ্ন এস.এস.সি.পরীক্ষার পর একটি ভালো কলেজে ভর্তি হবে।

৪. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের আচরণ হচ্ছে–

ক. পুষ্পহীন সৌরভ খ. সৌরভহীন পুষ্প
গ. বদ খেয়াল ঘ. লা-পরওয়া

৫. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধ অনুযায়ী জুয়েলের উচিত–

i. ভাব ও কাজের সমন্বয় করা
ii. ভাবের উচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করা
iii. বাস্তবধর্মী কাজে তৎপর হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

তুমি স্বপ্নে রাজা হতে পার, কোটি কোটি টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পার। কল্পলোকের সুন্দর গল্পও হতে পার, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন এক জগৎ। এখানে বড় হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শিক্ষার দ্বারা নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সঠিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বড়ো হতে হবে। সুতরাং কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

ক. যিনি ভাবের বাঁশি বাজিয়ে জনসাধারণকে নাচাবেন তাকে কেমন হতে হবে?
খ. লেখক 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে বলেছেন কেন?
গ. উদ্দীপকটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের যে দিকটি নির্দেশ করে তা বর্ণনা করো।
ঘ. 'কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু না খেয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক'– মন্তব্যটি 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন করো।

পড়ে পাওয়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

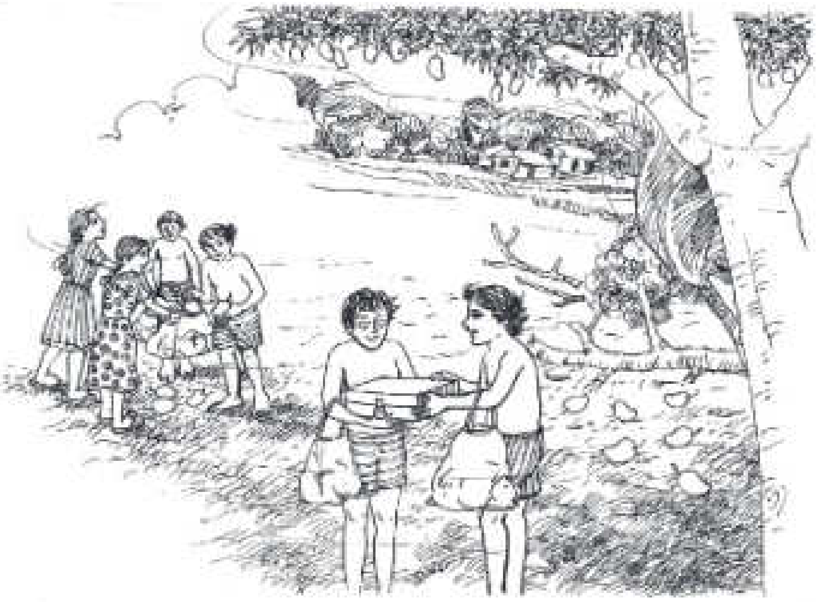

কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা।

বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই।

বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কান খাড়া করে বললে – ঐ শোন –

আমরা কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম – কী রে?

বিধু আমদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কান খাড়া করে রয়েছে।

হঠাৎ আবার সে বলে উঠল – ঐ-ঐ-শোন –

আমরও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ।

নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—

বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা? বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামব না। কালবৈশাখী।

আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কী বলছে। কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো! বাড়ুয্যেদের মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কী! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায় ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে তারই জয়।

সবাই বললাম— তবে থাক।

কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ তখনো দূর হয় নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মতো চাপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?

বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে।

এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।

অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠল, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগল পশ্চিম থেকে। বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ধুলোতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠান্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে বড় বড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামল।

বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মতো; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট-বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনাসুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।

এমন সময় বাদল কী একটা পায়ে বেঁধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে— দ্যাখ তো রে জিনিসটা কী?

আমি হাতে তুলে দেখলাম একটি টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি।

বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বললে—দেখি জিনিসটা?

— দ্যাখ তো, চিনিস?

— চিনি, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স।

— টাকাকড়ি থাকে।

— তাও জানি।

— এখন কী করবি?

— সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?

— তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।

টিনের ক্যাশ বাক্স হাতে আমরা দুজনে সেই অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দুজনে এখন কী করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল, থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।

বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—

— তা তো বটেই। কে জানবে আর।

— এখন কী করা যায় বল।

— বাক্স তো তালাবন্ধ—

— এখুনি ইট দিয়ে ভাঙি যদি বলিস তো—ওঃ না জানি কত কী আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দুজনে নেব, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাব। ২০২৩

ঝড়ের ঝাপটা আবার এলো। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্য দিনে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।

বাদল বলল—শীতে কেঁপে মরছি। কী করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহলে সবাইকে ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কী করবি?

— আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।

— ভাঙি তালা। ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে।

— না। তালা ভাঙিসনে। ভাঙলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে, ভেবে দ্যাখ। কোনো গরিব লোকের হয়তো। আজ তার কী কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেব বাক্সটা।

বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?

— দেব ভাবছি।

— কী করে জানবি কার বাক্স?

— চল, সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।

এক মুহূর্তে দুজনের মনই বদলে গেল। দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স ফেরত দেয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। বাক্স নিয়ে জল ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হলো বাক্সটা।

তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসল বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোস্টমের ডোবায়। আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমতো এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে- এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে বলা হলো বাক্স ফেরত দেয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বের করার। কারও মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হলো। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কী করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করব? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না।

অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি।

বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হলো।

বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো।

বাদল বলল—কী লিখব বলো—

— লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মতো। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি—

— বলো—

— আমরা একটা বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন। ইতি–বিধু, সিধু, নিধু, তিনু।

আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম—বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি?

আমাদের ভালো নাম লেখ।

বিধু বললে—লিখে দাও। ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখ।

তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হলো।

দু-তিন দিন কেটে গেল।

কেউ এল না।

তিন দিন পরে একজন কালোমতো রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কী চাও?

— বাবু, ইঁদিরভীষণ কার নাম?

— আমার নাম। কেন? কী চাই?

— একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?

আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কী রকম বাক্স?

— কাঠের বাক্স।

— না। যাও।

— বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।

— কী রঙের টিন?

— কালো।

— না। যাও—

— বাবু দাঁড়ান, বলছি। মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মতো—

— না, তুমি যাও।

লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে—ওর নয় রে। লোভে পড়ে এসেছে। ওর মতো কত লোক আসবে।

আবার তিন-চার দিন কেটে গেল।

বিধুর কাছে একজন লোক এলো তারপরে। তারও বর্ণনা মিলল না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে– যাও যাও, যা পার করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও।

আর কোনো লোক আসে না।

বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ।

সেবার আমাদের নদীতে এলো ভীষণ বন্যা।

বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু-একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অক্রূরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি—কী চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর খেত, লাউ-কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু পয়সা আয়ও পেত তরকারি বেচে। কোথায় রইল তাদের পটল-কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়িঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগল অক্রূরপুর চরের কাপালিরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এলো। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে

নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে। আরও দু-একজন প্রজা এসেছে খাজনা-পত্তর দিতে। আমরা দু ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি। এমন সময় একটা লোক এসে বললে—দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।

বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

— আজ্ঞে অন্ধাপুর থেকে। আমরা কাপালি।

— বোসো। কী মনে করে? তামাক খাও। সাজো।

লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগল। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিঘখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এলো। চাকরি না করলে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরবে।

বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।

লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাব। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিঘখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম। প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি—একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হলো না। সেই হলো শুরু—আর তারপর এলো এই বন্যে—

বাবা বললেন—বল কী? অতগুলো টাকা-গহনা হারালে?

—অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে—

আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কী রঙের বাক্স?

— সবুজ টিনের।

বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কী দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক ছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কি না?

বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হলে উকিল হবে, সবাই বলত।

আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে— ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরিবের ওপর এত দয়া আপনাদের?

বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে—দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কি না আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে—লিখতে জান তো?

না, ও উকিলই হবে বটে!

আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না।

শব্দার্থ ও টীকা

দিব্যি	—	চমৎকার। আশাতীতভাবে।
সংশয়	—	সন্দেহ। দ্বিধা।
গহনা	—	অলংকার।
অনাদৃত	—	অবহেলিত। উপেক্ষিত। গুরুত্ব দেওয়া হয়নি এমন।
বিচুলিগাদা	—	ধানের খড়ের স্তূপ।
নাটমন্দির	—	দেবমন্দিরে সামনের ঘর যেখানে নাচ-গান হয়।
বোষ্টম	—	হরিনাম সংকীর্তন করে জীবিকা অর্জন করে এমন বৈষ্ণব।
অপ্রতিভভাবে	—	বিব্রত বা লজ্জিতভাবে।
পত্রপাঠ বিদায়	—	তৎক্ষণাৎ বিদায়।
চৌকিদার	—	প্রহরী।
কাপালি	—	তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায়।
চণ্ডীমণ্ডপ	—	যে মণ্ডপে বা ছাদযুক্ত চত্বরে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা হয়।
দণ্ডবৎ	—	মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।
আড়ি	—	ধান, গম ইত্যাদির পরিমাপবিশেষ। ধান মাপার বেতের ঝুড়ি বা পাত্র।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই গল্প পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে নিজের জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে।

পাঠ-পরিচিতি

এটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোর গল্প। এটি 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ গল্পের কিশোররা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থসম্পদ নিয়ে লোভের পরিচয় দেয়নি। বরং তারা তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, বয়সে ছোট হলে কী হবে, তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ়। এই গল্পে কিশোরদের ঐক্য চেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাদের উন্নত মানবিক বোধেরও প্রকাশ ঘটেছে। তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরদের এমন সততা, নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিস্মিত, অভিভূত। কিশোররা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তারা তাদের

মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিবেচক তাকে মান্য করে তার ওপর আস্থা স্থাপন করে। এটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্রও ফুটে উঠেছে এ গল্পে।

লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার মুরাতিপুর গ্রামে, মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর গ্রামে। তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। মাতার নাম মৃণালিনী দেবী। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেশা ছিল কথকতা ও পৌরোহিত্য। ছোটগল্প, উপন্যাস, দিনলিপি ও ভ্রমণ-কাহিনি রচনার মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পান। তাঁর রচিত সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানবজীবন এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন সত্তায় সমন্বিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' উপন্যাস যেমন তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : 'আরণ্যক', 'ইছামতী'; গল্পগ্রন্থ : 'মেঘমল্লার', 'মৌরীফুল'; ভ্রমণ-দিনলিপি : 'তৃণাঙ্কুর', 'স্মৃতির রেখা'; কিশোর উপন্যাস : 'চাঁদের পাহাড়', 'মিসমিদের কবচ', 'হীরামানিক জ্বলে'। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ভালো কাজ করলে যে আনন্দ পাওয়া যায় তার পক্ষে তোমার অনুভূতি ব্যক্ত করো (একক কাজ)।

খ. 'পড়ে পাওয়া' গল্পের চরিত্রগুলো অবলম্বন করে একটি নাটিকা উপস্থাপন করো (দলগত কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাদের বাগানে আম কুড়াতে কালবৈশাখী উপেক্ষা করে সবাই ছুটছিল?

ক. চাটুয্যেদের খ. মুখুয্যেদের

গ. বাড়ুয্যেদের ঘ. গাঙ্গুলিদের

২. চাঁপাতলীর আমের ব্যাপারে এত আগ্রহের কারণ তা—

i. প্রচুর পাওয়া যায়

ii. খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু

iii. নির্বিঘ্নে কুড়ানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

৩. লেখকের চমৎকার অর্থে ব্যবহৃত 'দিব্যি' শব্দটি আমরা আর কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি?

ক. শপথ খ. বিশ্বাস

গ. সংশয় ঘ. অনবরত

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

স্কুলের ঝাড়ুদার শচী। পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিষ্কার করতে গিয়ে সে একটি মূল্যবান ঘড়ি পেল। তার লোভ হলো। ভাবল, ঘড়িটা মেয়ের জামাইকে উপহার দেবে। মেয়ে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। কিন্তু রাতে ঘুমুতে গিয়ে মনে হলো—এ অন্যায়, অনুচিত। যার ঘড়ি তার মনঃকষ্টের কারণে মেয়ের চরম অকল্যাণ হতে পারে। ঘড়িটা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া তার কর্তব্য। সে পরদিন তা-ই করল।

৪. শচী 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিভূ?

ক. বাদল খ. বিধু

গ. কথক ঘ. সিধু

৫. উল্লিখিত তুলনাটা কোন মানদণ্ডে বিচার্য? উভয়েই—

i. ন্যায় ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ

ii. লোকলজ্জার ভয়ে ভীত

iii. অকল্যাণ চিন্তায় তাড়িত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরিফ টেক্সি ক্যাব চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার একজন আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে সে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা গাড়ির ভিতরে দৃষ্টি পড়তে সে দেখতে পেল একটি মানিব্যাগ সিটের ওপর পড়ে আছে। ব্যাগে অনেকগুলো ডলার। কিন্তু ব্যাগে কোনো ঠিকানা পাওয়া গেল না। সে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করল। নিরুপায় হয়ে সে পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদককে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ জানায়।

ক. 'পড়ে পাওয়া' কী ধরনের রচনা?

খ. 'ওর মতো কত লোক আসবে'—বিধুর এ কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপকের আরিফকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়?— ব্যাখ্যা করো।

ঘ. কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও আরিফ চরিত্রটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল সুরকেই ধারণ করে আছে।—মূল্যায়ন করো।

২. সন্ধ্যায় দেখা গেল, নিজেদের ছাগলের সাথে অতিরিক্ত একটি ছাগলও আথালে ঢুকছে। এশার নামাজ পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খোঁজ নিতে এল না। দাদু বললেন, না, না, চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। এক কাজ কর, রফিক-শফিক বেরিয়ে পড়। প্রতিবেশী নাবিল আর তালিমকে সাথে নিয়ে দুজন দুদিকে যেও। মসজিদ থেকে চোঙ্গা নিয়ে গাঁয়ে ঘোষণা দিয়ে আস। কিছুক্ষণের মধ্যে দু-ভাই দাদুর পরামর্শ মতো বলতে লাগল, ভাইসব, একটি ছাগল পাওয়া গেছে। যাদের ছাগল তারা দয়া করে মতিন শিকদারের বাড়ি থেকে নিয়ে যান।

ক. লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ধরনের লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত?

খ. 'দুজনই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম।'— কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. রফিক-শফিকের চোঙ্গা ফোঁকার ঘটনাটি 'পড়ে পাওয়া' গল্পের কোন ঘটনার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের দাদু যেন 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল চেতনারই প্রতিভূ। বিশ্লেষণ করো।

তৈলচিত্রের ভূত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন সকাল বেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, 'বোসো, নগেন।'

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে চাকরকে ডেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

'বসতে বললাম যে? এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি?'

নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চুরি করে কি না, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের!'

গুরুতর কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দুহাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে।

নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে ছেলেটা এরকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনো দিন ছিল না। বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনের

আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।
নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ডাক্তার কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?'
পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ। পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে!'

'তবে —' দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার কাকা, প্রেতাত্মা আছে?'

'প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।'

'নেই? তবে —'

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনি। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি-ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল—শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, সারা জীবন তো ভক্তি-শ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য সত্যই ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কি না সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্প দামি আর অনেক দিনের পুরোনো, ভেতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং ওপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানা রকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে

তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তা ছাড়া কয়েকটা পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে—কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারো ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে 'আমায় ক্ষমা করো মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে—বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুচোখ বিস্ফারিত।

'তারপর?'

নগেন ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি।'

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনো দিন ফিট হয়েছিল নগেন?'

নগেন মাথা নেড়ে বলল 'ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয় নি। আপনি ভুল করেছেন ডাক্তার কাকা, এ ফিট নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তা হলে বুঝতে পারবেন।'

সমস্ত সকাল নগেন মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এমন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্বিধা-সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা। ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথার সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে। দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো

রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিকটা পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন কেমন অস্থির-অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলোটা থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—

'ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার কাকা।'

'অজ্ঞান হয়ে গেলে?'

'না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাই নি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কীসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে।'

পরাশর ডাক্তার খানিক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর আর কোনোদিন ছবিটা ছুঁয়েছ?'

'কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁলে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে। কোনোদিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনোদিন জ্ঞান থাকে।'

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কী করব ডাক্তার কাকা? এমন করে কদিন চলবে?'

পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।'

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরোনো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ

ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনি শুনিয়েছে, সারা দিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়—নিশ্চয় হয়: মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এ ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তার অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের ওপরের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল, 'আলোটা জ্বালব ডাক্তার কাকা?'

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন—'না।'

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই—'

নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। 'ভয় পেয়ে গেছেন?'

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পেছন দিকে দু পা ছিটকে গিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিল।

মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুঁজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন!'

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতিমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা হয়েছে?'

'আমি কি জানি! ছ মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখানে তেমনি অবস্থাতেই আছে।'

'ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোনদেশি ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছেন।'

নগেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেক দিন আগে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।'

'হ্যাঁ। সে এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেব কেন?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায় —'

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার কাকা —'

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না, ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে লিকেজ খুঁজতে হতো। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই —'

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসেবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না। তিনি হাঁফ ছাড়লেন। কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে প্রাণে মরতে হয় নি।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রকাণ্ড — অত্যন্ত বৃহৎ, অতিশয় বড়।
বিব্রত — ব্যতিব্যস্ত, বিপন্ন, বিচলিত।
উদ্‌ভ্রান্ত — বিহ্বল, দিশেহারা, হতজ্ঞান।
খাপছাড়া — বেমানান, উদ্ভট, অসংলগ্ন, এলোমেলো।

শ্রাদ্ধ	—	মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের হিন্দু আচার বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।
উইল	—	শেষ ইচ্ছেপত্র। মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বণ্টন বিষয়ে মালিকের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত ব্যবস্থাপত্র বা দানপত্র, যা তার মৃত্যুর পরে বলবৎ হয়।
প্রেতাত্মা	—	মৃতের আত্মা, ভূত।
অনুতাপ	—	আফসোস, কৃতকর্ম বা আচরণের জন্য অনুশোচনা, পরিতাপ।
তৈলচিত্র	—	তেলরঙে আঁকা ছবি।
প্রণাম	—	হাত ও মাথা দ্বারা গুরুজনের চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন।
আত্মগ্লানি	—	নিজের ওপর ক্ষোভ ও ধিক্কার, অনুতাপ, অনুশোচনা।
বিস্ফারিত	—	বিস্তারিত, প্রসারিত।
কস্মিনকালে	—	কোনো কালে বা কোনো কালেই।
ছলনা	—	কপটতা, শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা।
হৃৎকম্প	—	হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি।
মটকা	—	রেশমের মোটা কাপড়।
ভর্ৎসনা	—	তিরস্কার, ধমক, নিন্দা।
ইতস্তত	—	দ্বিধা, সংকোচ, গড়িমসি।
অশরীরী	—	দেহহীন, শরীরহীন, নিরাকার।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরাজমান, তা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য। বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূর করা সম্ভব। গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ভয়মুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত ও সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'তৈলচিত্রের ভূত' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কিশোর-উপযোগী ছোটগল্প। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ গল্পটি। ভূতে বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে তা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধির জয়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞানচেতনা দিয়ে ঘটনা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে ঐসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন চরিত্রের মধ্যে ভূত-বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয়—এরকম বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করেন বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে।

লেখক-পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মানিক' তাঁর ডাকনাম। ১৯০৮ সালে সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকার বিক্রমপুরে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯২৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। লেখালেখির কারণে বি. এসসি. পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এছাড়া 'দিবারাত্রির কাব্য', 'অহিংসা', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এছাড়া তিনি প্রচুর ছোটগল্পও রচনা করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাঁর লেখার প্রবণতা ছিল মানুষের মন বিশ্লেষণ করা। ১৯৫৬ সালে তিনি কলকাতায় মারা যান।

কর্ম-অনুশীলন

ক. ৪০০ শব্দের মধ্যে মজা পাওয়ার মতো একটি ভূতের গল্প লেখো (একক কাজ)।

খ. আমাদের সমাজে ভূত ছাড়াও অন্য কী কী কুসংস্কার আছে–সেগুলোর তালিকা করে টীকা লেখো (একক কাজ)।

(যাত্রার সময় হাঁচি, যাত্রার সময় পেছন থেকে ডাকা, এক শালিক দেখা, খালি কলস দেখা, কাক ডাকা ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নগেন কার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত?

ক. মাসির খ. পিসির

গ. মামার ঘ. দাদার

২. নগেনের সাথে পরাশর ডাক্তারের প্রথম দেখা হয় কখন?

ক. ২ মাস আগে খ. ৩ মাস আগে

গ. ৪ মাস আগে ঘ. ৫ মাস আগে

৩. মৃত মামার ছবি নগেনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কেন?

ক. জীবিত মামার প্রতি নগেনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল না।

খ. মামার মৃত্যুর আগেই ছবিটি আঁকা হয়েছিল।

গ. ছবির রুপার ফ্রেমে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল।

ঘ. নগেন ভূতকে খুব ভয় পেত।

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

আদনান সন্ধ্যাবেলা হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিল। এক সময় মনে হলো তার পেছনে পেছনে কেউ হাঁটছে। সে পেছনে ফিরে তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। ফলে সে ভয়ে কাঁপছিল। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে সে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তার মা বাতি নিয়ে ছুটে এসে দেখেন আদনানের পায়ের জুতার তলে পেরেক গাঁথা একটা কাঠি। এতক্ষণে আদনান ভয়ের কারণ খুঁজে পায়।

৪. উদ্দীপকের আদনানের সাথে 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের সাদৃশ্যের কারণ—

ক. তাদের বয়স কম খ. তারা অন্ধকারকে ভয় করত

গ. তারা ভীষণ ভীতু ছিল ঘ. তারা ভূত দেখেছিল

৫. এরূপ সাদৃশ্যের মূলে কোনটি বিদ্যমান?

ক. বাস্তবজ্ঞানের অভাব খ. প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়া

গ. মানসিক বিকাশ না হওয়া ঘ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা

সৃজনশীল প্রশ্ন

রফিক সাহেব শীতের ছুটিতে ভাগ্নি সাহানাকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে যান। রাতের আকাশ দেখার জন্য তারা খোলা মাঠে যান। অদূরেই দেখতে পান মাঠের মধ্যে হঠাৎ এক প্রকার আলো জ্বলে উঠে তা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ওটা কিসের আলো তা জানতে চাইলে সাহানার মামা বলেন, ভূতের! সাহানা ভয় পেয়ে তার মামাকে জড়িয়ে ধরে। মামা তখন তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, খোলা মাঠের মাটিতে এক প্রকার গ্যাস থাকে– যা বাতাসের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে। সাহানা বিষয়টা বুঝতে পেরে স্বাভাবিক হয়।

ক. 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন জাতীয় রচনা?

খ. পরাশর ডাক্তার নগেনকে ভর্ৎসনা করলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের সাহানা আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের বিশেষ মিল কোথায়?—ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "রফিক সাহেব আর 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তার উভয়কে আধুনিক মানসিকতার অধিকারী বলা যায়?" —উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

শেখ মুজিবুর রহমান

[পূর্বকথা : ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্রের ধারা অনুসারে পাকিস্তানের শাসনভার পাওয়ার কথা আওয়ামী লীগের। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এই পটভূমিতেই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। আবেগে, বক্তব্যে, দিক-নির্দেশনায় এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে 'ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে।]

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব— এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম—আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবন্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে—তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের

উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে—নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়—হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে

দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

(তথ্যসূত্র : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)

শব্দার্থ ও টীকা

নির্বাচনের পর	— ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি	— জাতীয় পরিষদ।
শাসনতন্ত্র	— রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহ, সংবিধান।
ভুট্টো সাহেব	— পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির তৎকালীন নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালি যেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।
আরটিসি	— রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। গোল টেবিল বৈঠক। সমস্যা সমাধানের কথা বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেও ভেতরে ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
মার্শাল ল	— সামরিক আইন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু রাখা হয়।
withdraw	— প্রত্যাহার।
ব্যারাক	— সেনাছাউনি।
সেক্রেটারিয়েট	— রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সচিবালয়।
সুপ্রিমকোর্ট	— সর্বোচ্চ আদালত।
হাইকোর্ট	— উচ্চ আদালত।
জজকোর্ট	— জেলা আদালত।
সেমি-গভর্নমেন্ট	— আধা-সরকারি।
ওয়াপদা	— ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
UNESCO	— জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী রচনাটি পাঠ করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারবে এবং দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ-পরিচিতি

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঙ্কুশ বিজয়। তবু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য গৌরবের। এই ভাষণ ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিখ্যাত।

লেখক-পরিচিতি

শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ৬ দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকালে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফেরেন এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে দেশে চরম অস্থিরতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়; ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ হয় এবং কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থ।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কোন আন্দোলনে কী জাতীয় ভূমিকা রেখেছেন, সে সম্পর্কে একটি রচনা লেখো (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?

ক. ১৯৬৯-এর ৭ই মার্চ   খ. ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ

গ. ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ   ঘ. ১৯৭৪-এর ৩রা মার্চ

২. আইয়ুব খানের পতনের পর কে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

ক শেখ মুজিবুর রহমান   খ. ইয়াহিয়া খান

গ. মওলানা ভাসানী   ঘ. জুলফিকার আলী ভুট্টো

সৃজনশীল প্রশ্ন

অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র – যেখানে সবারই সমান স্বাধীনতা থাকে। যেখানে প্রত্যেকেই হবে তার জগৎ-নিয়ন্তা। এটাই সেই গণতন্ত্র যাতে আপনাদের আজ অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদের শুধু মানুষ মনে করবেন, এবং সবাই একত্র হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে ব্রতী হবেন।

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম কত তারিখে?

খ. 'বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস'–বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণের সম্পূর্ণভাব ধারণ করে– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

লাইব্রেরি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

পুস্তকের শ্রেণিবদ্ধ সংগ্রহকে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বলা হয়। সকল প্রকার জ্ঞানকে একত্র করে স্থায়িত্বদানের অভিপ্রায় থেকে লাইব্রেরির সৃষ্টি। এক ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। আবার যে ব্যক্তি যে বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে, তার সবটুকু জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারন করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন এমন কোনো উপায় উদ্ভাবনের, যার দৌলতে দরকার অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা যায়। ফলে লাইব্রেরির সৃষ্টি।

লাইব্রেরি তিন প্রকার– ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাধারণ। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ব্যক্তিমনের খেয়ালমতো গড়ে ওঠে– তা হয়ে থাকে ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি যে ধরনের রচনা ভালোবাসে তার প্রাচুর্য, আর যে ধরনের রচনা পছন্দ করে না তার অনুপস্থিতি হয়ে থাকে ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, খেয়ালমতো গড়ে তোলে তার কল্পনার তাজমহল। কাব্যপ্রেমিক হলে কাব্যগ্রন্থ দিয়ে, কথাসাহিত্যপ্রেমিক হলে কথাসাহিত্য দিয়ে, ইতিহাসপ্রিয় হলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ দিয়ে সে সাজিয়ে তোলে তার টেবিল, আলমারির শেলফ – সবকিছু। কারো বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, আপত্তি করবার দাবি নেই, উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। এখানে সে স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিগত লাইব্রেরি যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিবিম্ব, পারিবারিক লাইব্রেরি তেমনি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রতিচ্ছায়া। এখানে যেমন একের রুচির ওপর বহুর অত্যাচার অশোভন, তেমনি বহুর রুচির ওপর একের জবরদস্তি অন্যায়। দশ জনের রুচির দিকে নজর রেখেই পারিবারিক লাইব্রেরি সাজাতে হয়।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরি ব্যক্তি বা পরিবারের মর্জিমাফিক গড়ে ওঠে। সাধারণের হুকুম চালাবার মতো সেখানে কিছুই নেই। লাইব্রেরিসম্পন্ন ব্যক্তির চালচলনে এমন একটা শ্রী ফুটে উঠতে বাধ্য, যা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করা দুষ্কর। সত্যিকার বৈদগ্ধ্য বা চিৎপ্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, লাইব্রেরি বা শ্রেণিবদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ গৃহসজ্জার কাজেও লাগে। আর এই ধরনের গৃহসজ্জায় লাভ এই যে, বাইরের পারিপাট্যের সঙ্গে তা মানসিক সৌন্দর্যেরও পরিচয় দেয়। লাইব্রেরি সৃজনে তৎপর হয়ে ধনী ব্যক্তিরা পুস্তক কেনার নেশা সৃষ্টি করলে দেশের পক্ষে লাভ হবে এই যে– অনবরত বাঁধানো পুস্তকগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে তাদের চামড়ার তলে যে একটি মন সুপ্ত রয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠবেন। লাইব্রেরি সৃজনের দরুন তাঁরা নিজেরা ততটা লাভবান না হলেও তাঁদের পুত্রকন্যাদের যথেষ্ট উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। হয়তো এই লাইব্রেরি থাকার দরুণই পরিণত বয়সে তাঁরা সুসাহিত্যিক বা সাহিত্য-সমঝদার হয়ে উঠবেন। এ আশা শুধু ভিত্তিহীন কল্পনা নয়, বড় বড় সাহিত্যিক বা কবিদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, বাল্যে তাঁরা পিতার অথবা পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে সাহিত্যসাধনার প্রেরণা লাভ করেছেন।

সাধারণ পাঠাগার আধুনিক জিনিস। কারণ, ঐতিহাসিকরা কী বলবেন জানি নে, যে জ্ঞানার্জনস্পৃহা থেকে পাঠাগারের জন্ম, ব্যাপকভাবে তার জাগরণস্পৃহা সহজে মেটানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের বাহন পুস্তক, আর পুস্তক কিনে পড়া যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা ধারণা করা সহজ। পুস্তকের ব্যাপারেও সমবায়নীতির প্রবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দশে মিলে কাজ না করলে সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে দশের মিলিত ফলস্বরূপ যা পাওয়া যায়, তাকেই সাধারণ লাইব্রেরি বলা হয়। অবশ্য সাধারণ লাইব্রেরি ব্যক্তির দানও হতে পারে। তবে ব্যক্তিগত প্রভাবের চাইতে সাধারণের প্রভাবই সেখানে বলবত্তর হতে বাধ্য। যদি না হয়, তবে সাধারণ পাঠাগার না বলে ব্যক্তিগত পাঠাগার বলাই ভালো।

সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তক শ্রেণিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হলেও পুস্তক নির্বাচনে বিশেষ সাবধানতার পরিচয় দিতে হয় বলে মনে হয় না।

সাধারণ লাইব্রেরির পুস্তকসংগ্রহ বিষয়ে আরেকটি কথা বলা দরকার। পুস্তক নির্বাচনকালে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় সংকীর্ণতার পরিচয় যত কম দেওয়া হয়, ততই ভালো। কারণ, যতদূর মনে হয়, পাঠাগার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রক্ষক নয়, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশক। আর ভালো পুস্তকলেখক যখন কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়, তখন পুস্তক নির্বাচনকালে সংকীর্ণ মনোভাবসম্পন্ন না হওয়াই ভালো।

জাতির জীবনধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত। এক ধারার নাম আত্মরক্ষা বা স্বার্থ প্রসার, আরেক ধারার নাম আত্মপ্রকাশ বা পরার্থ বৃদ্ধি। একদিকে যুদ্ধবিগ্রহ, মামলাফ্যাসাদ প্রভৃতি কদর্য দিক, অপর দিকে সাহিত্যশিল্প, ধর্ম প্রভৃতি কল্যাণপ্রদ দিক। একদিকে শুধু কাজের জন্য কাজ, অপর দিকে আনন্দের জন্য কাজ। একদিকে সংগ্রহ, আরেক দিকে সৃষ্টি। যে জাতি দ্বিতীয় দিকটির প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রথম দিকটির সাধনা করে, সে জাতি কখনও উঁচু জীবনের অধিকারী হতে পারে না। কোনো প্রকারে টিকে থাকতে পারলেও নব নব বৈভব সৃষ্টি তার দ্বারা সম্ভব হয় না। মানসিক ও আত্মিক জীবনের সাধনা থেকে চরিত্রে যে শ্রী ফুটে ওঠে, তা থেকে তাকে এক রকম বঞ্চিত থাকতেই হয়। জীবনে শ্রী ফোটাতে হলে দ্বিতীয় দিকটির সাধনা আবশ্যক। আর সেজন্য লাইব্রেরি এক অমূল্য অবদান।

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড। কারণ, বুদ্ধির জাগরণ-ভিন্ন জাতীয় আন্দোলন হুজুগপ্রিয়তা ও ভাববিলাসিতার নামান্তর, আর পুস্তক অধ্যয়ন ব্যতীত বুদ্ধির জাগরণ অসম্ভব।

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

শ্রেণিবদ্ধ	-	শ্রেণি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারি সারি সাজানো।
অভিপ্রায়	-	ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা।
সর্ববিদ্যাবিশারদ	-	সব বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী।
পারদর্শিতা	-	নৈপুণ্য, পটুতা।
উদ্ভাবন	-	আবিষ্কার, গবেষণা করে নতুন কিছু বের করা।
প্রতিবিম্ব	-	প্রতিচ্ছায়া, প্রতিচ্ছবি, প্রতিফলিত অবিকল রূপ।
স্বেচ্ছাচারী	-	যে আপন ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে।
স্বেচ্ছাচারী সম্রাট	-	যে রাজা আপন ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করেন। এখানে বাক্যাংশটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে — ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বই সংগ্রহকারী। যিনি খেয়ালমতো গড়ে তোলেন তাঁর কল্পনার সাম্রাজ্য।
তাজমহল	-	সম্রাট শাহ্‌জাহান যেমন করে তাজমহল তৈরি করে শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব রুচি ও শিল্পীমনের নিদর্শন।
কাব্যপ্রেমিক	-	যে কবিতা ভালোবাসে।
প্রতিচ্ছায়া	-	প্রতিচ্ছবি।
অশোভন	-	যা শোভন বা সুন্দর নয়।
জবরদস্তি	-	জুলুম, পীড়ন, বাড়াবাড়ি।
মর্জিমাফিক	-	ইচ্ছা অনুযায়ী, খেয়াল অনুসারে।
শ্রী	-	সৌন্দর্য।
দুস্তর	-	দুঃসাধ্য, সহজে করা যায় না এমন।
বৈদগ্ধ্য	-	পাণ্ডিত্য।
চিৎপ্রকর্ষ	-	জ্ঞানচর্চার ফলে মনের উন্নতি।
পারিপাট্য	-	শৃঙ্খলা, গোছানো ভাব।
সৃজন	-	সৃষ্টি।
সমবায় নীতি	-	বহু মানুষ মিলে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগে দেশের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণের নীতি।
সমঝদার	-	বোঝে এমন, রসজ্ঞ।
স্পৃহা	-	ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা।
বলবত্তর	-	অধিকতর শক্তিশালী।
পরার্থ	-	পরের উপকার।
সম্প্রদায়	-	বিশেষ সমাজ ও গোষ্ঠী।
বিকাশক	-	যা বিকাশ ঘটায়।
ভাব বিলাসিতা	-	ভাবনার বিলাসিতা, কাজের চেয়ে ভাবনায় বেশি মনোযোগ।

পাঠ-পরিচিতি

মানবসভ্যতার ক্রম অগ্রগতির ধারায় মানুষের অর্জিত জ্ঞান, মহৎ অনুভব সঞ্চিত হয়ে থাকে গ্রন্থাগারে। এর মাধ্যমে পূর্বপ্রজন্মের জ্ঞান সঞ্চারিত হয় উত্তরপ্রজন্মের কাছে। তাই জ্ঞানচর্চা, জ্ঞান-অন্বেষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ্রন্থাগার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের শ্রেণিবদ্ধ সংগ্রহশালা। সব ধরনের জ্ঞানের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে জ্ঞানচর্চার প্রসারে ধারাবাহিক ও স্থায়ী ভূমিকা পালনের জন্য লাইব্রেরির সৃষ্টি। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার এত বহুমুখী ও বিপুল যে, কোনো এক জনের পক্ষে সব জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। তাই এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা করতে পারেন। 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধটিতে জ্ঞানলাভ ও পাঠাগারের সম্পর্ক উপস্থাপন করেছেন মোতাহের হোসেন চৌধুরী। প্রবন্ধটি বইপাঠে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী করে তোলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারিবারিক লাইব্রেরি কার রুচির দিকে নজর রেখে সাজাতে হয়?

ক. ব্যক্তির
খ. পরিবারের
গ. দশজনের
ঘ. সাধারণের

২. 'ভালো পুস্তকলেখক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নন, সমস্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়'– বাক্যটিতে পুস্তকলেখকের কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. মানবিকতা
খ. সৃজনশীলতা
গ. সাম্যবাদিতা
ঘ. অসাম্প্রদায়িকতা

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

প্রমথ চৌধুরীর মতে, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি।

৩. প্রমথ চৌধুরীর মতাদর্শে 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের যে দিক প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

i. লাইব্রেরির গুরুত্ব
ii. আত্মিক বিকাশ
iii. জাতিসত্তার প্রকাশ

২০২৫

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকের কথকের ভাবনার প্রতিফলন ঘটবে যে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় তা হলো–

i. ব্যক্তিগত
ii. পারিবারিক
iii. সাধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাবার সঙ্গে একুশের বইমেলায় আসে অমি। সেখান থেকে বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে সে তার পছন্দমতো বিজ্ঞানের বইগুলো সংগ্রহ করে। শুধু বইমেলা থেকে নয়, অমি যেখানেই যায় সেখান থেকেই বিজ্ঞানের কোনো না কোনো বই কিনে নিয়ে আসে। আর এভাবেই তার বাসায় গড়ে তোলে এক বিশাল লাইব্রেরি।

ক. কোন ধরনের লাইব্রেরির পুস্তক শ্রেণিবদ্ধ করতে যথেষ্ট সতর্কতার পরিচয় দিতে হয়?

খ. জাতির জীবন ধারা গঙ্গা-যমুনার মতো দুই ধারায় প্রবাহিত- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের যে লাইব্রেরির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উক্ত শ্রেণির লাইব্রেরিকে অন্য কোনো শ্রেণির লাইব্রেরিতে রূপান্তর করা সম্ভব কি?" 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের আলোকে যৌক্তিক মত দাও।

সুখী মানুষ

মমতাজউদদীন আহমদ

চরিত্র পরিচিতি

নাম	বয়স
মোড়ল	৫০
কবিরাজ	৬০
হাসু	৪৫
রহমত	২০
লোক	৪০

(প্রথম দৃশ্য)

[মোড়লের অসুখ। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কবিরাজ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছে। মোড়লের আত্মীয় হাসু মিয়া আর মোড়লের বিশ্বাসী চাকর রহমত আলী অসুখ নিয়ে কথা বলছে।]

হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।

রহমত : শুনছি।

হাসু : ভালো করে শোনো, ঐ কবিরাজ যতই নাড়ি দেখুক, তোমার মোড়লের নিস্তার নাই।

রহমত : অমন ভয় দেখাবেন না। তাহলে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লেগে যাব।

হাসু : কাঁদ, মন উজাড় করে কাঁদ। তোমার মোড়ল একটা কঠিন লোক। আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড় জ্বালিয়েছে। এর গরু কেড়ে, তার ধান লুট করে তোমার মোড়ল আজ ধনী। মানুষের কান্না দেখলে হাসে।

রহমত : তাই বলে মোড়লের ব্যারাম ভালো হবে না কেন?

হাসু : হবেই না তো। মোড়ল যে অত্যাচারী, পাপী। মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না। দেখে নিও, মোড়ল মরবে।

রহমত : আর আজে-বাজে কথা বলবেন না। আপনি বাড়ি যান!

কবিরাজ : এত কোলাহল করো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।

রহমত : ও কবিরাজ, নাড়ি কী বলছে! মোড়ল বাঁচবে তো!

কবিরাজ : মূর্খের মতো কথা বল না। মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়। আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে তাই শ্রবণ কর।

হাসু : আমাকে বলুন। মোড়ল আমার মামাতো ভাই।

রহমত : মোড়ল আমার মনিব।

কবিরাজ : এই নিষ্ঠুর মোড়লকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে একটি কঠিন কর্ম করতে হবে।

হাসু : বাঘের চোখ আনতে হবে?

কবিরাজ : আরও কঠিন কাজ।

রহমত : হিমালয় পাহাড় তুলে আনব?

কবিরাজ : পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই আনতে হবে না।

মোড়ল : আর সহ্য করতে পারছি না। জ্বলে গেল। হাড় ভেঙে গেল। আমাকে বাঁচাও।

কবিরাজ : শান্ত হও। ও রহমত, মোড়লের মুখে শরবত ঢেলে দাও।

(রহমত মোড়লকে শরবত দিচ্ছে)

হাসু : ঐ মোড়ল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে। আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব।

মোড়ল : ভাই হাসু এদিকে এস, আমি সব দিয়ে দেব। আমাকে শান্তি এনে দাও।

কবিরাজ : মোড়ল, তুমি কি আর কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবে?

মোড়ল : আর বলব না। এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন মানুষের ওপর জবরদস্তি করব না। আমাকে ভালো করে দাও।

কবিরাজ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর কোনোদিন লোভ করবে?

মোড়ল : না। লোভ করব না, অত্যাচার করব না। আমাকে শান্তি দাও। সুখ দাও।

কবিরাজ : তাহলে মনের সুখে শুয়ে থাক, আমি ওষুধের কথা চিন্তা করি।

মোড়ল : সুখ কোথায় পাব? আমাকে সুখ এনে দাও।

হাসু : অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না।

মোড়ল : আমার কত টাকা, কত বড় বাড়ি! আমার মনে দুঃখ কেন?

কবিরাজ : চুপ কর। যত কোলাহল করবে তত দুঃখ বাড়বে। হাসু এদিকে এস, আমার কথা শ্রবণ কর। মোড়লের ব্যামো ভালো হতে পারে, যদি...

রহমত : যদি কী?

কবিরাজ : যদি আজ রাত্রির মধ্যেই—

হাসু : কী করতে হবে?

কবিরাজ : যদি একটি ফতুয়া সংগ্রহ করতে পার।

রহমত : ফতুয়া?

কবিরাজ : হ্যাঁ, জামা। এই জামা হবে একজন সুখী মানুষের। তার জামাটা মোড়লের গায়ে দিলে, তৎক্ষণাৎ তার হাড় মড়মড় রোগ ভালো হবে।

রহমত : এ তো খুব সোজা ওষুধ।

কবিরাজ : সোজা নয়, খুব কঠিন কাজ। যাও, সুখী মানুষকে খুঁজে দেখ। সুখী মানুষের জামা না হলে অসুখী মোড়ল বাঁচবে না।

মোড়ল : আমি বাঁচব। জামা এনে দাও, হাজার টাকা বখশিশ দেব।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

[বনের ধারে অন্ধকার রাত। চাঁদের ম্লান আলো। ছোট একটি কুঁড়েঘরের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে ভাবছে।]

রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে একজনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি সুখী নই।

হাসু : আর তো সময় নাই ভাই, এখন বারোটা। সুখী মানুষ নাই, সুখী মানুষের জামাও নাই। মোড়ল তো তাহলে

এবার মরবে।

রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা—

হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও; ভিখারি বলছে, আরও ভিক্ষা দাও; পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও। শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।

রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।

হাসু : চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।

রহমত : ভূত নাকি? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছভাজা করে খাবে।

হাসু : এই যে, ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ? বেরিয়ে এস।

রহমত : ভূতকে ডাকবেন না।

[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো]

লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?

হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ। তুমি কে?

লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।

হাসু : আঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?

লোক : না। সারাদিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে-দেয়ে গান গাইতে-গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার।

হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?

লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?

হাসু : তোমার সোনাদানা, জামাজুতা?

(লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে)

রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!

লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও।

হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ।

লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মস্ত বড় বাদশা।

রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস।

লোক : জামা!

রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।

২০১৮

লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!

হাসু : মিছে কথা বল না।

লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।

শব্দার্থ ও টীকা

কবিরাজ — বৈদ্য; আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে যিনি চিকিৎসা করেন।

নাড়ি পরীক্ষা — কবজির ধমনির গতি দেখে রোগ নির্ণয়।

মূর্খ — নির্বোধ, বোকা, অজ্ঞ।

শ্রবণ — কানে শোনা।

জবরদস্তি — জোরাজুরি।

ব্যামো — অসুখ, রোগ, ব্যারাম।

তাজ্জব — অদ্ভুত, বিস্ময়কর।

প্রাণখোলা — অকৃত্রিম, উদার, খোলা মনের।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ নাটিকা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করবে যে, অন্যায় ও অনৈতিকভাবে উপার্জিত অর্থ-বিত্তই মানুষের অশান্তির মূল কারণ। বরং সৎ পথে নিজ পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলেই জীবনে শান্তি মেলে। সুতরাং নীতিহীন পথে সম্পদ উপার্জনের পথ পরিহার করাই উত্তম।

পাঠ-পরিচিতি

'সুখী মানুষ' মমতাজউদদীন আহমদের একটি নাটিকা। এর দুটি মাত্র দৃশ্য। নাটিকাটির কাহিনিতে আছে, মানুষকে ঠকিয়ে, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে, ধনী হওয়া এক মোড়লের জীবনে শান্তি নেই। চিকিৎসক বলেছেন, কোনো সুখী মানুষের জামা গায়ে দিলে মোড়লের অসুস্থতা কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ গ্রাম খুঁজেও একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেল না।

শেষে একজনকে পাওয়া গেল, যে নিজের শ্রমে উপার্জিত আয় দিয়ে কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করে সুখে দিন কাটাচ্ছে। তার কোনো সম্পদ নেই, ফলে চোরের ভয় নেই। সুতরাং শান্তিতে ঘুমোনোর ব্যাপারে তার কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। শেষ পর্যন্ত সুখী মানুষ একজন পাওয়া গেলেও দেখা গেল তার কোনো জামা নেই। সুতরাং মোড়লের সমস্যার সমাধান হলো না। নাটকের মূল বক্তব্য – সুখ একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের অনেক সম্পদ থেকেও সুখ নেই। আবার আরেকজনের কিছু না থাকলেও সে সুখী থাকতে পারে।

লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদদীন আহমদ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা শেষে ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা— নাটক : 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'রাজা অনুস্বারের পালা', 'সাত ঘাটের কানাকড়ি',

'আমাদের শহর', 'হাস্য লাস্য ভাষ্য'; প্রবন্ধ-গবেষণা : 'বাংলাদেশের নাটকের ইতিবৃত্ত', 'বাংলাদেশের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'অর্থ-ঐশ্বর্যই সুখের একমাত্র নিয়ামক'—এ বিষয় অবলম্বনে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

খ. তোমার আশেপাশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামত অবলম্বনে 'সুখ' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সুখী মানুষ' নাটিকার দৃশ্য সংখ্যা কত?

ক. এক খ. দুই
গ. তিন ঘ. চার

২। 'সুখী মানুষ' নাটিকার মোট চরিত্র সংখ্যা কত?

ক. পাঁচ খ. ছয়
গ. সাত ঘ. আট

৩। 'মনের মধ্যে অশান্তি থাকলে ওষুধে কাজ হয় না'—এ কথার অর্থ কী?

ক. মনের পবিত্রতা সুস্থতার পূর্বশর্ত খ. প্রকৃত সুখ মোহমুক্তির মধ্যে
গ. নির্লোভ হলে সুস্থ থাকা যায় ঘ. কৃপণতাই ধনীদের মূল অসুখ

৪. 'সম্পদই অশান্তির মূল কারণ'—এ উক্তির ভাবগত সংগতি আছে কোনটির সঙ্গে?

ক. অপচয় কর না, অভাবে পড় না। খ. লাভের ধন পিঁপড়ায় খায়।
গ. লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ঘ. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

একজন লোকের অনন্ত ক্ষুধা। সে যা পায় তাই খায়। রেশনের চাল, গম, রিলিফের লোটাবাটি কম্বল। খায় পাথর পর্যন্ত। বদহজম না হয়ে যায় কোথায়? ভারমুক্ত হবার জন্য ছটফট করছে। কিন্তু হাজার মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বদ প্রভাব যে তার ওপর। পেট কাটা ছাড়া উপায় নেই। আঁৎকে ওঠে লোকটি।

৫. লোকটিকে কার সাথে তুলনা করা যায়?

ক. রহমানের খ. মোড়লের
গ. হাসুর ঘ. কবিরাজের

৬. তুলনাটা এ কারণে যে তারা উভয়ই—

i. পরধন অপহরণকারী

ii. নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত

iii. নির্দয় ও মানবপ্রেম শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জোবেদ আলী ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য। এই নিয়ে টানা পঞ্চম বারের মতো তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন। হবেনই বা না কেন? এলাকার মানুষের অসুখ-বিসুখ হলে সুস্থ না হওয়া অবধি তিনি তার শয্যা ছাড়েন না। সমস্যায় পড়লে সমাধান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার মুখে অন্ন রোচে না। সেই তার অসুখ হলে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করল—আল্লাহ, তুমি আমাদের জোবেদ ভাইকে সুস্থ করে দাও।

ক. আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে যাঁরা চিকিৎসা করেন তাঁদের কী বলে?

খ. হাসু মোড়লের মৃত্যুকামনা করে কেন?

গ. জোবেদ আলীর সঙ্গে 'সুখী মানুষে'র যে মিল আছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'মোড়ল যদি জোবেদ আলীর মতো হতেন তাহলে তার চিকিৎসার জন্য সুখী মানুষের জামা তালাশ করতে হতো না।'—বিশ্লেষণ করো।

২. সেলিম সাহেব নানা উপায়ে নানা পন্থায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। নদীর পাড় ভেঙে পড়ার মতো ইদানিং বিভিন্ন অজুহাতে সে পাহাড়ের বিরাট বিরাট অংশ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না। তার মনে হচ্ছে যাকে তিনি এক সময় সুখের উৎস ভেবেছিলেন তাই হয়ে উঠেছে এখন অসুখের মূল কারণ। ভাঙন যেভাবে লেগেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাবে।

ক. নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের পেশাগত পরিচয় কী?

খ. হাসু মোড়লের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তার অকল্যাণ কামনা করে কেন?

গ. মোড়ল চরিত্রের সঙ্গে সেলিম সাহেবের চরিত্রের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'মোড়ল আর সেলিম সাহেবের অসুখের মূল কারণ অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

শিল্পকলার নানা দিক

মুস্তাফা মনোয়ার

আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের এই কথাগুলিতে শিল্পকলার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সব মানুষই জীবনের এই আনন্দকে পাওয়ার জন্যে কত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়—নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা। যেমন— চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি কলাভঙ্গি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার নিত্য নতুন অবদান রেখে চলেছে শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। শিল্পকলার একটি অস্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝতে পারি কিন্তু শিল্পকলার সঠিক অর্থ কী আর শিল্পকলার গুণাগুণ কী, এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাহলে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন গান শুনে ভালো লাগে, ছবি দেখে ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগে কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। দেখা গেল, সকল শিল্পকলায় রূপ আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, রং আছে, বিশেষ গড়ন আছে, সবকিছুকে সাজাবার একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম আছে। এই নিয়মটি লুকিয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করে না, সুন্দরের মধ্যে মিলেমিশে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে। নিয়মটি না জানলেও সুন্দরকে চেনা যায়। একটি উপমা দেয়া যাক। পৃথিবীর সব ফুলই একই নিয়ম মেনে ফুল নাম পেয়েছে। আমরা দেখে বলি সুন্দর। এর নিয়মটি হলো, একই বিন্দু থেকে সকল পাপড়ি বিন্দুর চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু এক নিয়ম মেনেই কত রকম ফুল। নিয়ম মেনেও ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে। তোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর লাগলেই সুন্দর বলবে। সুন্দর দেখতে দেখতেই একদিন সুন্দরের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি জানতে পারবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম 'নন্দনতত্ত্ব'। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করা, সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূপ আছে, তার নাম স্বাধীনতা—অপর নাম যা খুশি তাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে, তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমি-র খুশি

নয়, অনেক মনে খুশির বিস্তার করা আমি। অন্ধকার ঘর আলোকিত করবার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ জ্বালাতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, কত রকম জিনিস প্রয়োজন হয়—ঘটি, বাটি থেকে বিছানাপত্র। শুধু প্রয়োজন মিটলেই মানুষ খুশি হয় না—মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন নকশি কাঁথা, রাত্রে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্রী—সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুঁই আর রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা করে সাজিয়েছে গাঁয়ের বধূরা। নকশিকাঁথা দেখলেই সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের কথা মনেই পড়ে না। এ কারণেই সকল জ্ঞানী মানুষ বলেন, সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে তৃপ্ত করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃপ্ত করল। অর্থাৎ প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।

এবার বিভিন্ন শিল্পকলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে কিছু বলা যাক। ছবি আঁকা। বিশ্বের সকল দেশেই শিশুরা ছবি আঁকে। বাংলাদেশের ছোটরাও খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকা মানে 'দেখা শেখা'। ছোটরা প্রকৃতিকে দেখে, মা-বাবা, ভাই-বোন মিলিয়ে একটা সমাজকে দেখে। প্রতিদিনের দেখা বিষয়বস্তু, রং, গড়ন, আকৃতি শিশুমনের কল্পনার সঙ্গে মিলেমিশে যায়। নানা রকম গল্প শুনে, দেশের কথা শুনে, কবিতা ছড়া শুনেও শিশু মনে ছবি তৈরি হতে থাকে। এ সকল দেখা-অদেখা বস্তু নিয়ে শিশুরা ছবি আঁকে কল্পনা-বাস্তব মিলিয়ে। নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে শেখে।

সকল শিল্পকলার মধ্যে কতকগুলি মূল বস্তু থাকে যেমন—বিন্দু, রেখা, রং, আকার, গতি বা ছন্দ, আলোছায়া গাঢ়-হালকার সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সকলের মিলনেই হয় ছবি বা ভাস্কর্য। আর আছে মাধ্যম, অর্থাৎ কোন মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। চিত্রকলার মাধ্যম হলো কালি-কলম, জল রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্রিত রং ইত্যাদি। ছোটদের জন্য প্যাস্টেল ও জল রং ব্যবহার করা সহজ হয়। বাংলাদেশে পুরাকালে জল রং দিয়েই ছবি আঁকত শিল্পীরা। পুরাতন পুথিতে তালপাতায় আঁকা ছবির বহু নিদর্শন আছে। বর্তমানেও জল রং অত্যন্ত প্রিয়, তবে এখন আর কেউ তালপাতায় আঁকে না, কাগজে আঁকে।

ভাস্কর্য। নরম মাটি দিয়ে কোনো কিছুর রূপ দেয়া বা শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানো। বিশেষ এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত মেটাল ঢেলে গড়ন বানানো, এই ধরনের কাজকে বলে ভাস্কর্য। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে নানান শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে। সকল শিল্পীর একটি দায়িত্ব আছে—দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা। বাংলায় একটি কথা আছে—'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'—কালি

মানে দেশের ঐতিহ্যে হাজার বছর প্রবাহিত কালি, কলম হলো শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম, আর মন হলো বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিল করে নিজেকে প্রকাশ করার মন। একটি দেশকে জানা যায় দেশের মানুষকে জানা যায় তার শিল্পকলা চর্চার ধারা দেখে। শিল্পকলা চর্চা সকলের জন্য অপরিহার্য।

শব্দার্থ ও টীকা

ভুবন	—	পৃথিবী, জগৎ, ভূমণ্ডল।
শিল্পকলা	—	সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাচ, গান প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।
রস	—	সাহিত্য পাঠ করে বা ছবি দেখে মনে যে অনুভূতি জাগে।
পুরাকাল	—	প্রাচীনকাল, অনেক আগেকার সময়।
গুহা-মানুষ	—	প্রাচীনকালে গুহায় বসবাসকারী মানুষ।
ভাস্কর্য	—	পাথর, ধাতু, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে বানানো শিল্পকর্ম।
স্থাপত্য	—	গৃহ বা ভবন নির্মাণের কাজ, নির্মাণশিল্প।
প্রাত্যহিক	—	প্রতিদিনের।
নকশিকাঁথা	—	সুঁই-সুতা দিয়ে নকশা করে বানানো কাঁথা।
গড়ন	—	আকার, আকৃতি, রূপ।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হবে। চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে। তারা নতুন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

এই রচনাটিতে লেখক সুন্দরের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সংগীত, নৃত্য, কবিতা সবকিছুর মধ্য দিয়েই সুন্দরকে প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতি জগতে সুন্দরের প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। তা দেখে মানুষ নতুন করে সুন্দরকে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মাধ্যমে চলে সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া। কখনো রেখার সাহায্যে, কখনো রঙের সাহায্যে, কখনো মাটি বা পাথরের সাহায্যে সুন্দরকে সৃষ্টি করা হয়। সুন্দর বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে। মানুষকে তা পরিশীলিত করে। সুন্দরের সৃষ্টিতে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

লেখক-পরিচিতি

মুস্তাফা মনোয়ার একজন চিত্রশিল্পী। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর পিতা। তিনি কলকাতা আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র। ঢাকায় চারুকলা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও শিল্পকলা একাডেমিতে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে পাপেট থিয়েটার ও অ্যানিমেশন শিল্পকলায় আধুনিকতা প্রচলনে তিনি অগ্রদূতের

ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া 'মনের কথা' নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘকাল শিশুদের উপযোগী শিল্পকলাবিষয়ক একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। ১৯৭২ সাল থেকে প্রচারিত শিশু প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বহুল জনপ্রিয় 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের রূপকার তিনি। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান প্রযোজনায় তিনি মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুস্তাফা মনোয়ার বিশিষ্ট নৃত্য পরিকল্পনাকারী ও সংগীত পরিচালক। দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সাফ গেমসের মাসকট নির্মাতা তিনি। তিনি একুশে পদকসহ বহু পদক ও পুরস্কার লাভ করেছেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. সুনির্দিষ্ট বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

খ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে স্পষ্ট ও সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতার আয়োজন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মুস্তাফা মনোয়ার হলেন একজন—

ক. চিত্রশিল্পী খ. ভাস্কর্যশিল্পী

গ. স্থাপত্যশিল্পী ঘ. কারুশিল্পী

২. কোনটির মধ্য দিয়ে একটি দেশ এবং দেশের মানুষকে জানা যায়?

ক. শিল্পকলাচর্চা খ. সাহিত্যচর্চা

গ. বিজ্ঞানচর্চা ঘ. চিত্রকলাচর্চা

৩। 'সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে' বলতে বোঝানো হয়েছে—

i. প্রয়োজনের মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না

ii. অপ্রয়োজনীয় অংশই কেবল মানব-মনকে তৃপ্ত করে

iii. প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

তকিব হাসান কম্পিউটার সায়েন্সে অনার্স পড়ছেন, সারাক্ষণ তার রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে কম্পিউটার নিয়ে তিনি বসে থাকেন। ছোট বোন মোহনা পূর্ণিমার রাতে ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখতে বললে সে বলে—ছাদে গিয়ে চাঁদ দেখার কী আছে, জানালা দিয়েই তো চাঁদ দেখা যায়। সে সব সময় মুখটা কেমন গম্ভীর করে বসে থাকে। সবার সাথে মেশেও না।

৪. শিল্পকলার বিচারে তকিব হাসানের মনে কীসের অভাব আছে?

ক. আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা খ. ভাব ও অনুসন্ধিৎসা

গ. আনন্দ ও অনুভূতি ঘ. আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ

৫. 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে তকিব হাসানের উক্ত অভাববোধ থাকার কারণ—

ক. শিল্পচর্চার অভাব খ. শিল্পকলার প্রতি অনাসক্তি

গ. সাহিত্যচর্চার অভাব ঘ. প্রকৃতির প্রতি অনাসক্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মেহেরুন্নেসা এবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয় দেখে তিনি বান্ধবীদের সাথে ক্যাম্পাস ঘুরতে ঘুরতে এলেন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে। সেখানে দেখেন—এক হাতে বন্দুক ধরে এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশালাকার এক ভাস্কর্য। নাম—সংশপ্তক। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও যে যুদ্ধ চালিয়ে যায় তাকেই বলে সংশপ্তক। ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা স্মরণ করে এই ভাস্কর্যটি বানানো হয়েছে। মনটা ভরে গেল মেহেরুন্নেসার।

ক. মুস্তাফা মনোয়ার কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ. 'প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলেই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ।' —কথাটি বুঝিয়ে লেখো।

গ. নবীনবরণ অনুষ্ঠানে মেহেরুন্নেসা শিল্পকলার কোন দিকটি দেখেছেন? এর বর্ণনা দাও।

ঘ. 'মেহেরুন্নেসার দেখা সংশপ্তকই শিল্পকলার প্রধান দিক।'—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

২. নন্দলাল বসু তাঁর 'শিল্পকলা' গ্রন্থে বলেছেন—'যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশি, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ সৃষ্টি বেশি, তাহাকে আমরা ললিতকলা বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। আবার যাহাকে আমরা ললিতকলা বলি, তাহাও আরেক দিক হইতে কারুকলা শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে। স্থাপত্যবিদ্যাপ্রসূত সুরম্য প্রাসাদকে যখন মানুষের বসবাস উপযোগী করিয়া দেখি তখন তাহা কারুশিল্প। আবার উহাকে যখন রূপময় অসীম সৌন্দর্য সৃষ্টি হিসেবে দেখি তখন তাহা চারুকলা।'

ক. 'পুরাকাল' শব্দের অর্থ কী?

খ. শিল্পকলাচর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য কেন?

গ. উদ্দীপকের ললিতকলা বলতে 'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের যে বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লেখিত চারুকলা ও কারুকলার সমন্বিত রূপই শিল্পকলা"—'শিল্পকলার নানা দিক' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

মংডুর পথে

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে, ২৪শে মে, ২০০১, মিয়ানমারের (বার্মার) সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে আমার মুখ, চোখ, কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল।

মংডু আমাদের টেকনাফের ওপারে। মাঝখানে নাফ নদী। মংডু বার্মার পশ্চিম সীমান্তের শহর। ব্রিটিশ যুগের বহু আগে থেকেই চট্টগ্রামের সঙ্গে তার যোগাযোগ। কখনও ছিন্ন, কখনও নিরবচ্ছিন্ন। পাদরি মেস্ট্রো সেবাস্টিন মানরিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পথে আসেন। তারও একশ বছর আগে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদের বসতির জায়গাকে ব্যান্ডেল বলত। চট্টগ্রামে এখন ব্যান্ডেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে।

সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আসার পর আমরা অভিবাসন ও শুল্ক দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম। এই পথে আসতে পেরে খুশি হয়েছি, পথে আরাকান পড়বে, আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী ম্রাউক-উ দেখতে পাব। এক সময় আরাকান বার্মা থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার পরিধি ছিল উত্তরে ফেনী নদী থেকে আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূল। সেখানে এসে পড়েছি এখন। আরাকান রাজ্যের রাজসভায় দৌলত কাজী, আলাওল সাহিত্যচর্চা করেছেন।

ছেলেবেলা থেকে চট্টগ্রামের পাশে অপরূপ মিয়ানমারের কথা শুনে এসেছি রূপকথার গল্পের মতো, আজ তা বাস্তবে ভেসে উঠল সন্ধ্যের আলোছায়ায়। অন্ধকার প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘের কোলে শুক্লপক্ষের চাঁদ। আমার হাতে ও কাঁধে ঝোলাঝুলি। শুল্ক অফিসের চৌহদ্দি পেরিয়ে পঞ্চাশ কদম না যেতেই বাঁ দিকে বড় বড় রেস্তোরাঁ, প্রায় জনমানবহীন। ডান দিকে মোড় ঘুরতেই দেখি এক মিয়ানমার কুমারী পানীয়ের পসরা নিয়ে বসেছে। একেবারেই ঝুপড়ি দোকান। কুমারীর দোকানের পাশেই আর একটি সে রকম দোকান। তারপর সামনেই শুরু হয়েছে বাড়িঘর ও দোকান। পথে নেমে পড়েছে তরুণ-তরুণী, মেয়ে-পুরুষ। পথে পথে মিয়ানমারের

যুবতি-তরুণী। কলহাস্যে মুখর। বাড়ির সামনে, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ যুবক, যুবতি, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। মিয়ানমারের সবাই লুঙ্গি পরে। মেয়েদের পরনে লুঙ্গি ও ঝলমলে ব্লাউজ জাতীয় জামা বা গেঞ্জি। চুলে ফুল গোঁজা, চিরুনি ও রিবন-ফিতে।

পাশ দিয়ে একটা পাইক্যা চলে যাচ্ছে। তিন চাকার রিকশা, যেমন মোটর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে ক্যারিয়ারে বউ বাচ্চা বসতে পারে, এও প্রায় তেমনি। সারা মিয়ানমারে আমাদের রিকশার বদলে পাইক্যা। স্থানীয় মুসলমানরা এর একচেটিয়া চালক। মংডুর ব্যবসাও প্রায় ওদের দখলে, আর হিন্দুরাও আছে।

ইউনাইটেড হোটেলে পৌঁছলাম, কিন্তু জায়গা হলো না। আগে-ভাগে যারা গেছে তারা জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রায় অনাথের মতো বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে নতুন হোটেলের উদ্দেশে চললাম। আমরা খুঁজে পেতে যে হোটেল পেলাম তার অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হয়। বেড়ার ঘরের দোতলার মাঝবারান্দায় বসেই টের পেলাম এটা চতুর্থ শ্রেণির হোটেল হতেও পারে। কাঠের মেঝে। কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল। বিছানায় গিয়ে পরখ করে দেখি উঁচু-নিচু চষা জমির মতো তোশক। মশারিতে বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ। মাথার উপরে পাখা আছে। কিন্তু রাত নয়টার পর তো বিজলি থাকবে না। তখন গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার অবস্থা হবে। নিলাম ফ্যান ছাড়া একটি কক্ষ। পরে মনে পড়ল ফ্যান থাকলেই বা কী! আমার তো রাতে ফ্যান সহ্য হয় না। বাত্তিও থাকবে না রাতে।

মাঝবয়সী এক নারী আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে গেল তার রয়েল রেস্তোরাঁয়, রাতের খাওয়ার জন্য। ইউনাইটেড হোটেলে যারা উঠেছে তারা নাকি ওদিকে এক মুসলিম রেস্তোরাঁয়, খেয়ে নিচ্ছে। রয়েল রেস্তোরাঁ, মন্দ নয়। সুন্দর ঝকঝকে টেবিল-টুল। বাসন-কোসন ভদ্র। ভাতের দোকান বলেই উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল। সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল। সাধারণ বর্মি রেস্তোরাঁয় নিচু টেবিল ও টুল থাকে।

রেস্তোরাঁর রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বুঝতে পারিনি। বলে কী! ওর বড় ছেলে কলেজে পড়ে! কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে রাখাইন আছে। এখন বুঝতে পারলাম আমার দেশের রাখাইনদের কত কম জানি। তাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার- আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে কী করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমার সখ্য নিবিড় হবে।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটি মেয়ে। লুঙ্গি এবং কোমর-ঢাকা ব্লাউজ পরেছে। ওর নাম ঝরনা। চেহারা ও স্বাস্থ্য গরিব ঘরের রোগা-পটকা নারীর মতো।

পোড়া লঙ্কা কচলে নুন-তেল দিয়ে ভর্তা করল। একটা প্লেটে তার সঙ্গে দিল কচি লেবুপাতা। বাহ্। খাস চট্টগ্রামের খাবার। আসলে এদের থেকে চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা এই খাবার নিয়েছে। চাকমা মারমারা ধানি লঙ্কা পুড়ে নুন ও পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে। পোড়া বা সেদ্ধ ধানি লঙ্কা কুইজ্যায় বা মাটির হামানদিস্তায় পিষে নেয়। একটা রাত কেটে গেল অখ্যাত বা কুশ্রী হোটেলে।

২৫শে মে, দ্বিতীয় দিন। মহাথেরোর সঙ্গে মংডুর প্রধান সড়ক ধরে চলেছি। বাজার। দুইপাশে বাড়ি, বাড়ির নিচে দোকান। ভেতরের বাড়িগুলো সেগুন কাঠের থাম বা পাকা থামের ওপর। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা পথ। গাছপালার পাতা চকচক করছে ধাতব নতুন টাকার মতো। বৃষ্টি শিরীষ, আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া সবই আমাদের মতো। পদাউকের পাতা লকলক করছে। পদাউকের সোনারঙ ফুল ফোটার এটিই সময়।

মিয়ানমারে ওদের নাম সেন্না। মংডুর কিছু গাছ ব্রিটিশ আমলের। ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি। বৃষ্টি শিরীষ, তেঁতুল এবং একটু কম বয়সী নারকেল গাছ। আছে কাঠগোলাপ ও সোনালু। নারকেল সর্বত্র। বাড়ির সামনের নারকেল গাছটির গোড়ার দিকে মাথা সমান উঁচুতে অর্কিড করেছে। তাতে রঙিন ও সাদা ফুল।

পাইক্যায় বোরকা পরা মহিলা। তার ওপর মাথায় ছাতা। ছবি তুলতে যেতেই ছাতা দিয়ে আড়াল তুলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শহরের পূর্ব দিকে শেভইজার সেতু পার হয়ে গেলাম। নদীর নাম সুধার ডিয়ার। এপারে মংডু, ওপারে সুধার পাড়া। মুসলিম গ্রাম।

সেতুর কাছেই পাঁচ-সাতজন মাছ নিয়ে বসেছে। তরিতরকারি নিয়ে বসেছে কয়েকজন। গ্রামের ছোট্ট বাজার। পাঁচ-ছয়টা বেড়ার দোকান। বুড়ো আঙুলের সমান চিংড়ির কিলো ৪ থেকে ৫শ চ্যা। আমাদের তুলনায় পানির দাম। টাকার হিসাবে ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। নদীর উজান দিকে বিলে দেখা যাচ্ছে চিংড়ির ঘের। অঢেল মাছ পাওয়া যায় ওখানে। চায়ের দোকান থেকে লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মংডুতে এখনো প্যান্ট দেখিনি। শুধু আমাদের পরনে প্যান্ট। মহাথেরো চীবর পরেছেন। বর্মিরা সবাই লুঙ্গি পরেছে। অফিস কাছারিতেও লুঙ্গি। গতকাল শুল্ক অফিসের দুজনের প্যান্ট দেখেছি। ওরা পুলিশ। অন্যদের লুঙ্গি। লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোডা এই তিন নিয়ে মিয়ানমার। ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু। গম (ভালো), ছাম্পান বা সাম্পান, ছা (শাবক), থামি (বর্মি রমণীদের সেলাইবিহীন লুঙ্গি) ইত্যাদি অনেক শব্দ বার্মা ও আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকেছে।

বাসের চালে যাত্রীদের সঙ্গে ফুঙ্গি। পথে ঘাটে ফুঙ্গি। সকালে তারা খালি পায়ে ভিক্ষে করতে বের হন। ভিক্ষে ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের চলবে না। ভিক্ষাই তাদের জীবিকা। ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঞ্জি থাকে, কোমরে বেল্ট জাতীয় অর্থাৎ সেলাই করা কাপড়ের কোমর বন্ধনী থাকে। এসব মিলে ত্রিচীবর। আর হাতে থাকে ছাবাইক বা ভিক্ষাপাত্র। আদিতে এটি কাঠ বা লোহার হতো। এখন লাক্ষা দিয়ে তৈরি হয়। ভিক্ষুদের চীবর বিশেষ মাপে এবং অনেক জোড়া দিয়ে সেলাই করা হয়। এটি নিয়ম। সাধারণ লাল ও লালের কাছাকাছি রঙে চীবরে রঙ করা হয়। বার্মায় ফুঙ্গিদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।

ছেলে-বুড়ো যুবক-যুবতি সবার পরিধানে লুঙ্গি। স্কুলের পোশাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। বর্মি মুসলমান-হিন্দু-বড়ুয়া-খ্রিষ্টান সবার লুঙ্গি। বর্মিরা শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। মংডুর মুসলিমরা শার্ট পরে লুঙ্গির বাইরে। বার্মা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে। মাত্র একশ বছরের মধ্যে সারা বাংলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লুঙ্গি চলে গেছে। লুঙ্গি, শার্ট ও বর্মি কোট, মাথায় বর্মি টুপি, পায়ে দুই ফিতের মজবুত স্যান্ডেল বর্মিদের জাতীয় পোশাক।

লোকজন আমাদের দেখছে। আমাদের পোশাক ও চাল-চলন ওদের থেকে ভিন্ন। সব দেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে। সেতু পেরিয়ে ফিরে আসছি। বিদ্দুর এসে মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে বর্মি পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে খালি জায়গায় বড় শিরীষ গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নুডলস বিক্রি করছে। ভাসমান দোকান। সকালের টিফিন এ রকম এক দোকানে পুলকসহ খেয়েছি। নুডলস, পোড়া লঙ্কাগুড়ো, তেঁতুলের টক, কলার থোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে স্যুপ, ডিমসেদ্ধ মিশিয়ে খেয়েছি। ডিমের খোসা ফেলে

কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ক্ষিপ্র গতিতে। আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে। সকালের জন্য আদর্শ খাবার বলা যায়। সঙ্গে বিনি পয়সায় দুধ চিনি ছাড়া চা দিয়েছে। দোকানি মাঝবয়সী মহিলা। ইঙ্গিতে, ইংরেজিতে কোনোমতে এক রকম করে কথা হলো। বুঝতে পারছি সারা ভ্রমণ এভাবে অপূর্ণ কথাবার্তা বলতে হবে।

দোকানটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মাথার উপর ছত্রাকার শিরীষ গাছের নিচে পলিথিন টাঙিয়ে দিয়েছে। লম্বা বেঞ্চিতে খাবারের বড় বড় ডেকচি। টুল আছে বসার। তরুণী বলল, বিকিকিনি শেষ। নুডলস আছে, কিন্তু মশলাপাতি ও তেঁতুলের ঝোল ফুরিয়ে গেছে। ওখান থেকে একটু এগিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। মালকিন বসে আছে চেয়ারে। রোয়াইংগা মুসলিম বয় আছে দুজন। কিন্তু বিস্কুট বা সে রকম কোনো খাবার নেই। দুধ চিনির চা ও বিনি পয়সার চা আছে। দোকানের ভেতরে আরেক মহিলা চুরুট সিগারেট ও পান বেচতে বসেছে। অন্য মহিলারা আছে রান্নাঘরে। চা বানিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা চিরস্বাধীন। দোকানের মালিক তারা। সবই খুব সাধারণ মানের। চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম।

শব্দার্থ ও টীকা

নিরবচ্ছিন্ন	—	একটানা, অবিরাম, নিরন্তর।
পাদরি	—	খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক।
অভিবাসন	—	স্বদেশ ছেড়ে অন্য দেশে বসবাস।
শুল্ক দফতর	—	পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির ওপর কর ধার্য করে এমন অফিস।
দৌলত কাজী	—	সতেরো শতকের কবি, আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচর্চা করেন।
আলাওল	—	সতেরো শতকের কবি, আরাকান রাজসভায় সাহিত্যচর্চা করেন। 'পদ্মাবতী' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।
শুক্লপক্ষ	—	অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত চন্দ্রকলার বাড়ার সময়।
ক্যারিয়ার	—	গাড়ির পেছনে থাকা মালপত্র বা জন পরিবহনের জায়গা।
গ্লাভস	—	দস্তানা, হাতমোজা।
মালকিন	—	মহিলা মালিক, মালিকের স্ত্রী।
হামানদিস্তা	—	দ্রব্যসামগ্রী গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র ও দণ্ড।
মহাথেরো	—	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান গুরু।
চ্যা	—	মিয়ানমারের টাকা।
চীবর	—	বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় গৈরিক পোশাক।
ফুঙ্গি	—	মায়ানমার অঞ্চলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।

প্যাগোডা — বৌদ্ধমন্দির।

লাক্ষা — গালা, লাল রঙের বৃক্ষনির্যাস।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী একটি দেশের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। ওই দেশ সম্পর্কে তাদের মনে আগ্রহ ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

আমাদের পূর্ব দিকের দেশ মিয়ানমার। সেই দেশ ভ্রমণের ফলে লেখক যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার কিছু বিবরণ এই রচনায় পরিবেশিত হয়েছে। মিয়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের শহর মংডু দিয়ে লেখকের ওই দেশ সফর শুরু হয়েছিল। মংডুর মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাবসা–বাণিজ্য সম্পর্কে একটি ধারণা এই রচনা থেকে পাওয়া যায়। মংডুতে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোক সম্পর্কেও পরিচয় আছে এতে। সেখানকার মেয়েরা অনেকটা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। মিয়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য থাকলেও মংডুতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানের বসবাস লক্ষ করেছেন লেখক।

লেখক-পরিচিতি

বিপ্রদাশ বড়ুয়ার জন্ম ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ইছামতী গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি শিশু একাডেমিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন, লিখেছেন শিশুতোষ গল্প-উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— ছোটগল্প: 'যুদ্ধজয়ের গল্প', 'গাঙচিল'; উপন্যাস : 'মুক্তিযোদ্ধারা'; প্রবন্ধ : 'কবিতায় বাকপ্রতিমা'; নাটক : 'কুমড়োলতা ও পাখি'; জীবনী : 'বিদ্যাসাগর', 'পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন'; শিশুতোষ গল্প : 'সূর্য লুঠের গান', শিশুতোষ উপন্যাস : 'রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য'। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং দুবার অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'মংডুর পথে' ভ্রমণ কাহিনিটির কোন কোন বিষয় তোমাকে আনন্দ দান এবং অনুপ্রাণিত করেছে তার বিবরণ দাও।

খ. তোমার ব্যক্তিগত ভ্রমণের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর (একক কাজ, ছবি, ভৌগোলিক চিত্র ইত্যাদি সংযোজন করা যাবে)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মিয়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কী বলা হয়?

ক. পুরোহিত খ. ফুঙ্গি

গ. ব্রাহ্মণ ঘ. মহাথেরো

২. ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর দেখতে কেমন?

ক. কাঁধ কাটা গেঞ্জির মতো খ. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো

গ. সেলাই করা লুঙ্গির মতো ঘ. কোমরের বেল্টের মতো

৩. সবদেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে—

i. পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে

ii. চালচলন দেখে

iii. খাবার-দাবার দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অন্নদাশঙ্কর রায় ফ্রান্সের প্যারিস নিয়ে লেখা 'পারী' প্রবন্ধে বলেছেন—'পারীর যারা আসল অধিবাসী, খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করার সময়ও জামা সেলাই করে। জামা-কাপড়ের শখটা ফরাসিদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসি মেয়েদের ও শিশুদের।'

৪. উদ্দীপকে 'মংডুর পথে' প্রবন্ধের মিয়ানমারবাসীর সংস্কৃতির যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো—

i. ভোজন বিলাসিতা

ii. ভূষণ বিলাসিতা

iii. শ্রমনিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নারকেল শ্রীলংকানদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। নারকেল তেল ছাড়া তারা কোনো খাবার রান্না করে না। কারিতে নারকেল তেল ছাড়াও গুঁড়া শুঁটকি মাছ ব্যবহার করা হয়। এই গুঁড়া শুঁটকিকে তারা মসলার অংশ হিসেবে দেখে। এরা রান্নায় প্রচুর মসলা এবং লাল মরিচ ব্যবহার করে।

২. শ্রীলংকার রাস্তায় যেসব তরুণী চলাচল করে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। দামি পোশাক ও সাজগোজের দিকে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। স্পষ্টতই মনে হয়, এরা জীবন-যাপনে সহজ-সুন্দর এবং এতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ক. সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো বস্ত্রটির নাম কী?

খ. 'বাস্তেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে'—বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপক ১–এ 'মংডুর পথে' ভ্রমণ কাহিনীর যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. মিয়ানমারবাসীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পুরো দিকটিই উদ্দীপক ২–এ প্রকাশ পেয়েছে–'মংডুর পথে' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

২০২১

বাংলা নববর্ষ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন! শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে যে এতটা প্রাণের আবেগে এবং গভীর ভালোবাসায় এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার বাঙালিকে এ উৎসব পালন করতে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এ উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে-দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ববাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে।

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে বিপুলভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হলে মুখ্যমন্ত্রী ও জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সরকার বাংলা

নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ববাংলার বাঙালি পিছু হটেনি। সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট (১৯৬১)। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানট নববর্ষের যে-উৎসব শুরু করে, স্বাধীন বাংলাদেশে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে।

এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদ্‌যাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতই মনে করেন মুগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজনাই একে 'সন' বা 'সাল' বলে উল্লেখ করা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর 'সাল' হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বঙ্গাব্দও বলেন কেউ কেউ।

বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখও করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়েছে।

পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারাবছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন। হালখাতা উপলক্ষে দোকানিরা ঝালর কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধুনা জ্বালানো হতো। মিষ্টিমুখ করানো হতো গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।

বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বুদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। সে-মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন

আর নেই। আগে গ্রামবাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না। আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর-মোষের গাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহুসময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন চালু হওয়ায় সে-সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলন মেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এই সব মেলা। আবার বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।

নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানাস্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে 'জব্বারের বলী খেলা' বলা হয়।

আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষদিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির। এ অনুষ্ঠান এখন খুব একটা দেখা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয়। নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে এরা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে 'বৈসাবী' নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে হতো গরুর দৌড়, হা-ডু-ডু খেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি।

আমাদের নববর্ষ উৎসব '৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে নারীরা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা।

শব্দার্থ ও টীকা

পাকিস্তান আমল — ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সময়।

ছায়ানট — সংস্কৃতি চর্চার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।

আবহমান — যা আগে ছিল এবং এখনও আছে।

পুণ্যাহ — প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের প্রতীকী অনুষ্ঠান।

হালখাতা — পয়লা বৈশাখে আয়োজিত অনুষ্ঠান-বিশেষ।

কবিগান — বাংলা গানের বিশেষ ধারা। দুজন গায়ক পালা করে একে অন্যের যুক্তি খণ্ডন করেন গানে গানে।

কীর্তন — গুণ-বর্ণনা, ভক্তিমূলক গান।

যাত্রা — প্রাচীন বাংলার দৃশ্যকাব্য, মঞ্চে নাট্যাভিনয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। এছাড়া তারা পাহাড়িদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে।

পাঠ-পরিচিতি

বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আজকের বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে পেরেছে, তার পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। কারণ পাকিস্তানিরা নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাধা দিয়েছিল এবং এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছিল বাঙালিরা। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ইতিকথা মিশে আছে।

বাংলা সন কে, কবে প্রচলন করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধরে নেওয়া হয় সম্রাট আকবরের সময় এ সনের গণনা আরম্ভ হয়। পরে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ এ উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে। বাঙালি গৃহিণীরাও আমানিসহ নানা ব্রত-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে। পাহাড়ি অবাঙালি জনগোষ্ঠীও বৈসাবি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মতো করে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে।

লেখক-পরিচিতি

শামসুজ্জামান খান ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ জেলার চারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ছিলেন। শামসুজ্জামান খান লেখক, গবেষক ও ফোকলোরবিদ হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো— প্রবন্ধগ্রন্থ: 'নানা প্রসঙ্গ', 'গণসঙ্গীত', 'মাটি থেকে মহীরূহ', 'আধুনিক ফোকলোর চিন্তা', 'ফোকলোর চর্চা' ইত্যাদি। রম্য-রচনা: 'ঢাকাই রঙ্গরসিকতা', 'গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্য: 'দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ', 'লোভী ব্রাহ্মণ ও তেনালীরাম', 'ছোটদের অভিধান' (যৌথ)। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। শামসুজ্জামান খান ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় দাও (একক কাজ)।

খ. বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তুমি তোমার বিদ্যালয়ে কী ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করবে সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা তৈরি করো (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলা সন চালু করা হয় কোন খ্রিষ্টাব্দে?

ক. ১৫৫৬ খ. ১৫৬১

গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৬৭

২. সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. আরবি খ. বাংলা

গ. ফারসি ঘ. উর্দু

৩. বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত কারণ—

i. এ উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ।

ii. এ সময় আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করি।

iii. এটি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

টুটুল টেলিভিশনে মধ্যযুগের নববর্ষের অনুষ্ঠানের কিছু অংশ দেখছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে ধনী-গরিব সবাই জামা কাপড় পরে জমিদার বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে। সেখানে তারা খাওয়া-দাওয়া শেষে জমিদারকে জমির খাজনা পরিশোধ করে ফিরে আসছে।

৪. টুটুলের দেখা অনুষ্ঠানটিকে কী বলা হয়?

ক. হালখাতা খ. পুণ্যাহ

গ. বৈসাবি ঘ. নবান্ন

৫. এ ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনটি?

ক. অর্থনৈতিক খ. রাজনৈতিক

গ. সামাজিক ঘ. ধর্মীয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। আজ তাদের খুব আনন্দের দিন, কারণ আজ নববর্ষ। তারা দুইজনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে চলে যায় রমনার বটমূলে। সেখানে কত মানুষের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, শিশু, বুড়ো, সবাই সেজেছে নতুন সাজে। সেখানে সীমার খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। সীমা খালা-খালু সবার খোঁজ পেল তন্বীর কাছ থেকে। ছোট খালাতো বোনের জন্য কিনে দিল নানান খেলনা। নিজের বাড়ির জন্য কিনে নিল কুলা, ঝুড়ি, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি। চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

ক. ছায়ানট কত সাল থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে।

খ. হালখাতা বলতে কী বোঝায়?

গ. চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? — ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে।— এ মন্তব্যের মূল্যায়ন করো।

২০২৫

বাংলা ভাষার জন্মকথা

হুমায়ুন আজাদ

কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

আজ থেকে একশ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথা মতো চলেনি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত

থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাংলার? এ সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ করা যায় গভীর মিল। এ ভাষাগুলো যে সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্থ করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম 'সংস্কৃত', অর্থাৎ বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ ভাষা বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্য-ভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবদ্ধ হতে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা– বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি,মাগধি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার।

শব্দার্থ ও টীকা

ভাষাতাত্ত্বিক – ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন।

শ্লোক – সংস্কৃত ভাষায় রচিত দুই পঙ্ক্তির কবিতা।

দুর্বোধ্য – যা বোঝা কঠিন, সহজে বোঝা যায় না এমন।

বিধিবন্ধ – নিয়ম দ্বারা শাসিত, নিয়মের অধীন।

ঘনিষ্ঠ – নিকট, নিবিড়, খুব কাছের।

উদ্ভূত – উৎপন্ন, জাত।

উৎপত্তি – সূচনা, শুরু, জন্ম।

উদ্ভব সূচনা, জন্ম, অভ্যুদয়, উৎপত্তি।

মাগধী প্রাকৃত – মগধ অঞ্চলে প্রচলিত সেকালের মানুষের মুখের ভাষা।

গৌড়ী প্রাকৃত – গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত সেকালের মানুষের মুখের ভাষা।

অপভ্রংশ – মুখের ভাষার পরিবর্তিত রূপ, প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তর।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। বাংলা ভাষা যে সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগবে।

পাঠ-পরিচিতি

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভাষার ধর্ম বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। এক সময় ধারণা করা হতো বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে। কিন্তু সংস্কৃত ছিল লেখার ভাষা। আর প্রাকৃত ছিল মুখের ভাষা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে মানুষের ধারণা হয়, প্রাকৃত ভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর জন্ম হয়েছে।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন প্রথম ভারতীয় উপভাষা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেন এবং দেখান যে, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও মনে করেন, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। তবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাড়িখাল গ্রামে। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে 'শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা', 'বাক্যতত্ত্ব' ইত্যাদি। কিশোর পাঠকদের জন্য লেখা দুটি গ্রন্থ 'লালনীল দীপাবলি', 'কতো নদী সরোবর'। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অলৌকিক ইস্টিমার' ও 'জ্বলো চিতাবাঘ' উল্লেখযোগ্য। তিনি সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। হুমায়ুন আজাদ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে হুমায়ুন আজাদ রচিত 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়।)

খ. তোমার এলাকার আঞ্চলিক শব্দের একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অনেকেই কোন ভাষাকে বাংলার জননী মনে করত?

ক. হিন্দি খ. গুজরাটি

গ. সংস্কৃত ঘ. মারাঠি

২. কোনটি উঁচু শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা ছিল?

ক. বাংলা খ. সংস্কৃত

গ. প্রাকৃত ঘ. মৈথিলি

৩. প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝায়—

ক. গণমানুষ সচরাচর যে ভাষায় কথা বলে

খ. শিক্ষিত জনগণ যে ভাষায় কথা বলে

গ. অঞ্চল বিশেষের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে

ঘ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যে ভাষায় কথা বলে

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পৃথিবীতে ২৬টি ভাষাবংশ আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আবার অনেকগুলো ভাষা রয়েছে। যার একটি ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ইন্দো-ইরানীয় শ্রেণির দুইটি প্রধান ভাগ—ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। বাংলা ভারতীয় আর্য ভাষারই বংশধর।

৪. আর্য ভাষার বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটির নাম কী?

ক. বৈদিক খ. সংস্কৃত

গ. প্রাকৃত ঘ. অপভ্রংশ

৫. উল্লিখিত বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরটির সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো–

i. এটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা

ii. এই স্তরের বিবর্তিত রূপই হচ্ছে বাংলা ভাষা

iii. খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ পর্যন্ত এ ভাষার কাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ইফতি পিয়া অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। একদিন বাংলা ব্যাকরণে ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পড়ার সময় দুটো বৈশিষ্ট্যের দিকে ওর নজর আটকে গেল। বৈশিষ্ট্য দুটি হলো–

(১) ভাষা যত কঠিন শব্দ দিয়েই শুরু হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের ফলে তা সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। যেমন-চক্র > চক্ক > চাকা, চর্মকার > চম্মআর > চামার, হস্ত > হত্থ > হাত ইত্যাদি। একসময় এরকম সরলীকরণ হতে হতে একটি নতুন ভাষারই উদ্ভব হয়।

(২) কালের পরিক্রমায় একটি ভাষা স্থানিক ও কালিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বহুরূপী হয়ে ওঠে। যেমন– ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সারা পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে। ইফতি পিয়া ভাবতে থাকে।

ক. 'সংস্কৃত' শব্দের অর্থ কী?

খ. একদল লোক বাংলাকে 'সংস্কৃতের মেয়ে' মনে করত কেন?

গ. অনুচ্ছেদের ১ নং বৈশিষ্ট্যটির মধ্য দিয়ে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ইফতি পিয়া পঠিত ২ নং বৈশিষ্ট্যটি 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

গণঅভ্যুত্থানের কথা

সভ্যতার আদিকাল থেকে মানুষ নানা ধরনের সমাজে বসবাস করে আসছে। যে কোনো সমাজের শাসনকাজ পরিচালনা করে শাসকেরা। অতীতে রাজা-রানি বা সম্রাটেরা শাসনকাজ পরিচালনা করত। তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান বা পরিবারের কেউ একজন শাসনের দায়িত্ব পেত। কিন্তু আধুনিককালে সাধারণত ভোটের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা কে পাবে তা নির্ধারিত হয়। তবে এখনো দুনিয়ায় বেশ কিছু দেশ আছে, যেখানে ভোট ছাড়াও শাসক নির্ধারিত হয়। শাসক যেভাবেই নির্ধারিত হোক, তার প্রধান কর্তব্য হলো সকল মানুষের কল্যাণ করা এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে দেশের উন্নতি সাধন করা।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যুগে যুগে শাসকেরা তাদের কর্তব্যের প্রতি অনেকসময় উদাসীন হয়ে পড়ে। তারা দেশের অধিকাংশ মানুষকে বাদ দিয়ে নিজ গোষ্ঠী বা দলের অল্পকিছু মানুষের জন্য কাজ করতে থাকে। অনেকসময় তারা অত্যাচারী হয়ে ওঠে। এমনকি হত্যা আর লুটতরাজেও লিপ্ত হয়। এ ধরনের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মানুষ তখন বিদ্রোহ করে। শাসক ও শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। সেই আন্দোলনের সাথে যখন সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে শাসককে তাদের দাবি মেনে নিতে বা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে, তখন আমরা তাকে বলি গণঅভ্যুত্থান।

দুনিয়াজুড়ে সব কালে, সব দেশেই আমরা এরকম গণঅভ্যুত্থান ঘটতে দেখেছি। বাংলাদেশের নিকট-ইতিহাসেও এরকম তিনটি বড়ো বড়ো গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে, যা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি ১৯৯০ সালে, যাকে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান বলা হয়, আ তৃতীয়টি হয়েছে একেবারে সম্প্রতি – ২০২৪-এর জুলাই মাসে। অনেকেই একে জুলাই গণঅভ্যুত্থান বা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নামে অভিহিত করছেন।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রধান দাবি ছিল তিনটি – জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগ, শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের মুক্তি এবং আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রসমাজের এগারো দফা বাস্তবায়ন। জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন ১৯৫৮ সালে। তখন বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং এখনকার পাকিস্তানের নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। আইয়ুব খানের সরকার শিল্প-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরিসহ সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করত। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করেন। তখন আইয়ুব খান মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে কারাবন্দি করে রাখেন। ১৯৬৮ সালের শেষদিকে আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ ছাত্ররা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ছাত্ররা ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এগারো দফা দাবি উত্থাপন করেন। এই আন্দোলনে কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়। ফলে আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ছাড়াও বাংলাদেশের সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। আন্দোলন দমন করতে পুলিশ গুলি চালায়। ছাত্রনেতা আসাদ, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মতিয়ুর, সার্জেন্ট জহুরুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহা, সন্তান কোলে ঘরের মধ্যে বসে থাকা এক মা আনোয়ারা বেগমসহ অসংখ্য মানুষ শহিদ হন। সেনাবাহিনী নামিয়ে এবং কারফিউ জারি করেও মানুষকে নিবৃত্ত করা যায়নি। ছাত্র-শিক্ষক আর মেহনতি মানুষের ব্যাপক আত্মত্যাগ ও অংশগ্রহণের ফলে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সফল হয়। আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

আমাদের ইতিহাসে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এ অভ্যুত্থানেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তারপর অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। কথা ছিল বাংলাদেশ হবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের দেশ। সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্ত হবে এদেশের মানুষ। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষের আবার আশাভঙ্গ শুরু হয়। বৈষম্য কমে না, সুবিচার মেলে না, হত্যা থামে না, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মানুষ আবার সর্বক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে ১৯৯০ সালে। ১৯৮২ সালে একটা নির্বাচিত সরকারকে জোর করে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। দীর্ঘ নয় বছরের শাসনে তিনি এদেশের মানুষের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেন, বিরোধী দলগুলোর প্রতি চরম নির্যাতন পরিচালনা করেন, দেশে কায়েম করেন ভয়াবহ স্বৈরশাসন। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস ছিল তখনকার বাংলাদেশের সাধারণ চিত্র।

এ দেশের মানুষ তার শাসনকে শুরু থেকেই মেনে নেয়নি। ক্ষমতা দখলের অল্পদিনের মধ্যেই ১৯৮৩-৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। ছাত্রনেতা সেলিম-দেলোয়ারসহ বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে সে আন্দোলন দমন করা হয়। পরে ১৯৮৭ সালে প্রতিবাদী জনতা আরেকবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে

পড়ে। নুর হোসেন বুকে-পিঠে "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক" লিখে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। কিন্তু কিছু দাবিদাওয়া মেনে নিয়ে সরকার আবারও তার পতন ঠেকাতে সক্ষম হয়। এরপর ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পর ছাত্রআন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করা হয়। তারা দশ দফা দাবিনামা পেশ করেন। সকল দল মিলে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করে। পুলিশের গুলিতে ডাক্তার মিলন, জেহাদসহ বহু মানুষ শহিদ হন। এরপর সারাদেশের মানুষ রাস্তায় নেমে এলে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করে বিদায় নেন।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের মানুষ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চেয়েছিল, অধিকারের রাষ্ট্র দেখতে চেয়েছিল; ছাত্রসমাজ মানসম্পন্ন শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ চেয়েছিল। কিন্তু তারপর একের পর এক সরকার ক্ষমতায় আসলেও পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। বৈষম্য কমেনি, অধিকার বাড়েনি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ আরো খারাপ হয়েছে। মানুষ আবারও আশাভঙ্গের শিকার হয়েছে।

চরম বৈষম্য, অপমান আর জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে এদেশের মানুষ তাই আবারও রাস্তায় নামে ২০২৪ সালে। শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তিনি নানা কায়দাকানুন করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে একের পর এক প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। বাংলাদেশের মানুষের ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নেন। পুরো দেশকে একটি পরিবারের শাসনে পরিণত করেন। উন্নয়নের নামে নজিরবিহীন লুটপাট চলতে থাকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে এক দলীয় এবং পারিবারিক বিষয়ে পরিণত করেন। বিরোধী নেতাকর্মীদের জেলজুলুম ও হয়রানির মধ্য দিয়ে রাজনীতিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলেন।

এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে ছাত্রসমাজ সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক কোটাব্যবস্থা ছিল, তার সংস্কার চেয়ে আন্দোলন শুরু করে। ২০১৮ সালে এই আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে সরকার কোটাব্যবস্থার সংস্কার না করে সকল ধরনের কোটাই বাতিল করে দেয়। কিন্তু ২০২৪ সালে এসে সরকার আবারও কোটাব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার কৌশল গ্রহণ করলে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামের সংগঠন গড়ে তোলে। তাদের সাথে ক্রমশ সকল ধরনের সংগঠন, দল ও ব্যক্তি যুক্ত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে সরকার তা দমন করতে ব্যাপক নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু তাতেও আন্দোলন থামে না। সরকারি-বেসরকারি সকল ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে। তাদের সাথে যুক্ত হন রিকশাওয়ালা, খেটেখাওয়া মানুষ, অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

সরকার আন্দোলনরত জনতাকে স্তব্ধ করে দিতে সব ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু দেশরক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মানুষ মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে আন্দোলন চালিয়ে যায়। দুহাত প্রসারিত করে বুকে বুলেট নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন ছাত্রনেতা আবু সাঈদ। রাজপথে আন্দোলনরত সহযোদ্ধাদের পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ। মায়ের কোলে থাকা, বাবার হাতে থাকা, ছাদে-বারান্দায় খেলতে থাকা অসংখ্য শিশু নিহত হয়। অসংখ্য মা-বাবা ও খেটে খাওয়া মানুষ শাহাদত বরণ করেন। অবস্থা এমন হয় যে, গুলি করে এবং হত্যা করেও মানুষকে রাস্তা থেকে সরকার সরাতে পারে না। এমতাবস্থায় সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে ভারত চলে যান। তৈরি হয় বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের এক নতুন ইতিহাস।

আগের দুই অভ্যুত্থানের সাথে এবারের অভ্যুত্থানের একটা বড়ো পার্থক্য হচ্ছে, আগের দুবার শিক্ষার্থীরা প্রধান ভূমিকা রাখলেও আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানে এরকম কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছিল না। আন্দোলন পরিচালনা করেছে শিক্ষার্থীরা। তাদের সাথে সকল ধরনের সংগঠন এবং সর্বস্তরের মানুষ যুক্ত হয়।

কিন্তু এতো মানুষ রাস্তায় নেমেছিল কেন? হাজারো মানুষ জীবন দিল কেন? কেনই-বা হাজার হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করে আন্দোলন চালিয়ে গেল?

কারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল এক সুন্দর বাংলাদেশের। এক অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের, যেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতি বা আঞ্চলিক কোনো বৈষম্য থাকবে না। রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে কেউ নিপীড়নের শিকার হবেন না। ভিন্নমত থাকবে, এবং পার্থক্যও থাকবে। কিন্তু সবাই সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নেবেন।

মনে রাখতে হবে, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সরকারের পতন হলেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে যায় না। এজন্য আমাদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হবে। অনেক কাজ করতে হবে। সবাইকে পড়াশোনা করে মানুষ হতে হবে। দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সমাজ থেকে সব ধরণের অন্যায় ও বৈষম্য দূর করতে হবে। একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই ২০২৪-এর শহিদ ও আহতদের আত্মদান সার্থক হবে।

(সংকলিত)

শব্দার্থ ও টীকা

অন্তর্ভুক্তিমূলক	– যেখানে সকলের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়।
কারফিউ	– সান্ধ্য আইন; নির্ধারিত সময়ে বাড়ির বাইরে বা রাস্তায় না যাওয়ার সাময়িক নির্দেশ।
কোটা ব্যবস্থা	– সাধারণত পড়াশোনা বা চাকরির ক্ষেত্রে একটি গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত সংখ্যা বোঝায়।
নজিরবিহীন	– অভূতপূর্ব; যার নজির নাই।
বৈষম্য	– সমান যোগ্যতার ব্যক্তিদের অধিকারের পার্থক্য।
স্বৈরশাসন	– একটি শাসন ব্যবস্থা, যেখানে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে এবং গণ-আকাঙ্ক্ষা, প্রচলিত আইন বা রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো রাষ্ট্র পরিচালনা করে।
স্বৈরাচার	– স্বেচ্ছাচার; ইচ্ছামত আচরণ।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ প্রবন্ধ পাঠ করে শিক্ষার্থীরা গণবিরোধী শাসকদের শাসন ও শোষিত জনতার প্রতিবাদ সম্পর্কে জানতে পারবে। রাষ্ট্রে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা সচেতনতা অর্জন করবে।

পাঠ-পরিচিতি

শাসকশ্রেণি যখন সুশাসন বাদ দিয়ে অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তখন নির্যাতিত-নিপীড়িত জনতা বিদ্রোহ করে; শাসক এবং শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে শুরু করে আন্দোলন-সংগ্রাম। সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক যখন গণদাবি মেনে নেয় বা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়, তখন আমরা সে আন্দোলনকে বলি গণঅভ্যুত্থান।

বাংলাদেশের নিকট ইতিহাসে তিনটি বড় গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে– ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের, ১৯৯০ সালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এবং ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে। ১৯৬৯ ও ১৯৯০ সালের আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে, কিন্তু ২০২৪ সালের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে জনতার বিজয়।

কিন্তু স্বৈরশাসকের পতনই শেষ কথা নয়। সুন্দর, সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আন্তরিক হতে হবে; তাহলেই শহিদ ও আহতদের ত্যাগ সার্থক হবে।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার জানা কোনো শ্রমিকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনি লেখো।

খ. ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হয়েছেন এমন একজন শহিদের পরিচয় দাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে কত সালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়?

ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৯০
গ. ২০১৮ ঘ. ২০২৪

২. কোনো দেশের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো–

i. গণ-আন্দোলন দমন করা
ii. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা
iii. দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি রাজতন্ত্রের দমননীতির প্রতীক বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়। রাজপুরুষদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করতো তাদের এই বাস্তিল দুর্গে বন্দি করে নির্যাতন করা হতো। শত শত বছরের সেইসব নির্যাতন, নিপীড়ন, সামাজিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক অনাচারসহ বহুমাত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব ছিল ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক জঁ-জ্যাক রুশো ছিলেন এই আন্দোলনের মূল প্রবক্তা; আর ফরাসি বিপ্লবকে সফল করেছে ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার দরিদ্র মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। অনেক মৃত্যুর বিনিময়ে জনতার জয় হয়, ফ্রান্স মুক্তি পায় রাজতন্ত্রের কবল থেকে।

ক. ১১ দফা দাবি উত্থাপন করে কোন সংগঠন?

খ. 'গণঅভ্যুত্থান' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের 'ফরাসি বিপ্লব' কী ধরনের আন্দোলন? তোমার পাঠ্য 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের ফরাসি বিপ্লবে আন্দোলনকারীদের ভূমিকার সঙ্গে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা' প্রবন্ধে উল্লেখিত বাংলাদেশের তিনটি গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনকারীদের ভূমিকার তুলনা করো।

কবিতা

মানবধর্ম

লালন শাহ্

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥

কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ॥

গর্তে গেলে কূপজল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে ॥

জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ বাজারে ॥

শব্দার্থ ও টীকা

কয়	— বলে।
জেতের	— জাতের। এখানে জাতি বা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে।
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়	— জন্ম বা মৃত্যুর সময়।
কূপজল	— কুয়োর পানি।
গঙ্গাজল	— গঙ্গা নদীর পানি। এখানে পবিত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। গঙ্গার জল হিন্দুদের কাছে পবিত্রতার প্রতীক।
জেতের ফাতা	— জাত বা ধর্মের বৈশিষ্ট্য অর্থে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, ধর্ম বা সম্প্রদায়গত পরিচিতির চেয়ে মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই বড়। তারা জাত-পাত বা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি বা মিথ্যে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে।

পাঠ-পরিচিতি

'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' গানটি 'মানবধর্ম' কবিতা হিসেবে এ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এ কবিতায় লালন ফকির মানুষের জাত-পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। লালন নিজে কোন ধর্মের বা জাতের এমন প্রশ্ন আগেও ছিল, এখনো আছে। লালন বলেছেন, জাতকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। মনুষ্যধর্মই মূলকথা। কারো গলায় মালা, কারো হাতে তসবি থাকে। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন জাতের পরিচয় বহন করে। কিন্তু জন্ম বা মৃত্যুর সময় মানুষের জাতের কোনো চিহ্ন থাকে না। মানুষ জাত ও ধর্মভেদে যে ভিন্নতার কথা বলে লালন তা বিশ্বাস করেন না।

কবি-পরিচিতি

লালন শাহ্ মানবতাবাদী মরমি কবি। সাধক সিরাজ সাঁই বা সিরাজ শাহ্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি লালন সাঁই বা লালন শাহ্ নামে পরিচিতি অর্জন করেন। গানে তিনি নিজেকে ফকির লালন হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের চিন্তা ও সাধনায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞানের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিলনে তিনি নতুন এক দর্শন প্রচার করেন। গানের মধ্য দিয়ে তাঁর এই দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাত্মভাব ও মরমি রসব্যঞ্জনা তাঁর গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেন।
লালন শাহ্ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঝিনাইদহ, মতান্তরে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার চারদিকে নানা শ্রেণিপেশা ও ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষ রয়েছে। এদের সম্পর্কে তোমার সহপাঠীদের মনোভাব জেনে একটি গবেষণা নিবন্ধ তৈরি কর। শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্নমালা তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে হবে। জাতি, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষই যে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য— এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের কোন পরিচয়টি বড় হওয়া উচিত?

ক. সামাজিক খ. ধর্মীয়
গ. মানবিক ঘ. পেশাগত

২. লালনের মতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর—

i. জাতের বড়াই
ii. কূপের জল
iii. বংশ কৌলিন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

৩. লালন শাহ্ রচিত গানটি 'মানবধর্ম' শিরোনামে গৃহীত হয়েছে। শিরোনামটির মর্মার্থ নিচের কোন পঙ্‌ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. এসো আজ মুঠি মুঠি মাখি সে আলো!

খ. শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

গ. কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা।

ঘ. পথশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।

৪. উক্ত মর্মার্থে মূলত প্রকাশ পেয়েছে লালন শাহ্'র–

i. অধ্যাত্মভাব

ii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা

iii. মানবতাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।'

ক. 'কূপজল' অর্থ কী?

খ. জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় কেন? —ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় মানুষের যে মিল পাওয়া যায় তা আলোচনা করো।

ঘ. উদ্দীপক ও 'মানবধর্ম' কবিতায় যে-ধর্ম চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা মূল্যায়ন করো।

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে,   এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো   তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,   নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর,   হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো   পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা   সেবে সর্বজন;
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি,   কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,

ভুল দোষ, গুণ ধর
অমর করিয়া বর   দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস   কী বসন্ত, কী শরদে!

শব্দার্থ ও টীকা

মিনতি — বিনীত প্রার্থনা।
পরমাদ — প্রমাদ; ভুল-ভ্রান্তি।
কোকনদ — লাল পদ্ম।
নীর — পানি; জল।
শমন — মৃত্যুর দেবতা।
মক্ষিকা — মাছি।
শ্যামা জন্মদে — শ্যামল জন্মভূমি অর্থে।
বর — আশীর্বাদ।
মানস — মন।
তামরস — পদ্ম।
শরদে — শরৎ কাল বোঝাতে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে স্বদেশের প্রতি শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধা ও বিনয়ভাব জেগে উঠবে। বিদেশের ঐশ্বর্য ও জৌলুস সত্ত্বেও নিজ দেশের প্রতি মনের গভীরে আগ্রহবোধ সৃষ্টি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত কয়েকটি গীতি কবিতার একটি 'বঙ্গভূমির প্রতি'। এ কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেশকে কবি মা হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে ভেবেছেন তার সন্তান। প্রবাসী মধুসূদন ভেবেছেন—মা যেমন সন্তানের কোনো দোষ মনে রাখেন না, দেশমাতৃকাও তাঁর সব দোষ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্য তিনি বিনয়ের সঙ্গে এও বলেছেন যে, তাঁর এমন কোনো মহৎ গুণ নেই, যে-কারণে তিনি স্মরণীয় হতে পারেন। বিনয়ী কবি তাই দেশমাতৃকার কাছে এই বলে প্রণতি জানাচ্ছেন, তিনি যেন দেশমাতৃকার স্মৃতিতে পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকেন।

কবি-পরিচিতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক। তিনি মহাকাব্য, গীতিকাব্য, সনেট, পত্রকাব্য, নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। শৈশব থেকে তাঁর মনে কবি হওয়ার তীব্র বাসনা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, বিলেত না গেলে কবি হওয়া যাবে না। বিলেতে গেলে সুবিধা হবে—এ আশায়

তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। পরে তিনি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাংলায় সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও তিনি গ্রিক, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রহসন : 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'; নাটক : 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী'; পত্রকাব্য : 'বীরাঙ্গনা' ইত্যাদি। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে একটি সনেট-সংকলনও তিনি রচনা করেন। তিনি ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে যশোরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'বঙ্গভূমির প্রতি' শীর্ষক কবিতাটি নিয়ে আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে। শুদ্ধ উচ্চারণ, উচ্চারণে স্পষ্টতা, শ্রবণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মক্ষিকা'র সমার্থক শব্দ কোনটি?

ক. মৌমাছি খ. মাছি
গ. বোলতা ঘ. ফড়িং

২. নরকুলে ধন্য কে?

ক. ক্ষমতাবান ব্যক্তি খ. দীর্ঘজীবী মানুষ
গ. যিনি কীর্তিমান ঘ. মন্দিরের সেবক

নিচের কবিতাংশ পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক. ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম– যেন এই দেশেতে মরি।

খ. বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল।

৩. কবিতাংশে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার কোন চরণটির ভাব প্রকাশ পেয়েছে?

ক. অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে!
খ. রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
গ. চিরস্থির করে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
ঘ. তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর

৪. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটির মতো (খ) কবিতাংশেও প্রকাশ পেয়েছে—

i. স্বদেশের প্রতি অনুরাগ

ii. স্বদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ

iii. প্রশান্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

২. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!

ক. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাকাব্যের নাম কী?

খ. কবি বর প্রার্থনা করেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের প্রথম কবিতাংশের আলোকে 'ফুটি যেন স্মৃতি-জলে' চরণটির ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "দ্বিতীয় কবিতাংশ ও 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার মূল সুর একই"– তুমি কি একমত? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন,'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে,'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে,'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।
নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।
ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কী জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা!
আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন—

তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন।
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।
　　বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
　　প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, এ কি!
　　বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
　　একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
　　সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
　　অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
　　সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন—
　　ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
　　সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
　　দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
　　ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
　　স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।
হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালি,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, 'আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব—
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!'
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম, 'শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!'
বাবু কহে হেসে 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।'
আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে! ১৩০২

শব্দার্থ ও টীকা

বিঘে — বিঘা শব্দের চলিত রূপ। জমির পরিমাপ বিশেষ। কুড়ি কাঠা বা ১৪৪০০ বর্গফুট বা ১৩৩৪ বর্গমিটার পরিমাণ জমি।

ভূস্বামী — অনেক জমির মালিক, জমিদার।

দিঘে — দৈর্ঘ্যে, লম্বা দিকের মাপে।

পাণি — হাত।

বক্ষে জুড়িয়া পাণি — বুকে জোড় হাত রেখে অনুনয় করে।

সপ্ত পুরুষ — পূর্ববর্তী সাত বংশধর বা প্রজন্ম।

লক্ষ্মীছাড়া — লক্ষ্মী ছেড়েছে এমন, দুর্ভাগা, ভাগ্যহীন।

ক্রুর — নিষ্ঠুর, নির্দয়।

ডিক্রি — আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামা।

খত — ঋণপত্র, ঋণের দলিল।

ভূরি ভূরি — প্রচুর।

কাঙাল — নিঃস্ব, দরিদ্র।

মোহগর্ত — মোহের ক্ষুদ্র গহ্বর।

বিশ্বনিখিল — গোটা দুনিয়া, সমগ্র পৃথিবী।

হেরিলাম — দেখলাম।

ধাম — স্থান, তীর্থস্থান।

ভূধর — পর্বত, পাহাড়।

নমো নমো নম — নমস্কার, বন্দনাজ্ঞাপক অভিব্যক্তি বিশেষ।

সমীর — বাতাস, বায়ু।

ললাট — কপাল।

খেলাগেহ — খেলাঘর।

নিশীথ — গভীর রাত।

নিশীথ শীতল স্নেহ — হৃদয়জুড়ানো গভীর মমতা।

প্রহর — তিন ঘণ্টা কাল, দিনরাত্রির আট ভাগের এক ভাগ।

গোলা — শস্য রাখার মরাই বা আড়ত।

তৃষাতুর — পিপাসা বা তৃষ্ণায় কাতর।

পঁহুছিনু — পৌঁছে গেলাম।

লভিল — লাভ করল, পেল।

১৩০১

উড়ে — ভারতের উড়িষ্যা বা ওড়িয়া প্রদেশের লোক।

কলরব — কোলাহল, হট্টগোল, হৈচৈ।

পারিষদ — মোসাহেব, পার্শ্বচর।

ঘটে — মাথার মগজে, এখানে ভাগ্যে অর্থে ব্যবহৃত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শোষক শ্রেণির নিষ্ঠুর শোষণ ও গরিবদের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে। গরিবদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'দুই বিঘা জমি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। দরিদ্র কৃষক উপেন অভাব-অনটনে বন্ধক দিয়ে তাঁর প্রায় সব জমি হারিয়েছে। বাকি ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি। জমিদার তাঁর বাগান বাড়ানোর জন্য সে জমি কিনে নিতে চায়। কিন্তু সাত পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত সে জমি উপেন বিক্রি করতে না চাইলে জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় সে। মিথ্যে মামলা দিয়ে জমিদার সে জমি দখল করে নেয়। ভিটেছাড়া হয়ে উপেন বাধ্য হয় পথে বেরুতে। সাধু হয়ে সে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরে। কিন্তু পৈতৃক ভিটের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না।

একদিন চির-পরিচিত গ্রামে সে ফিরে আসে। গ্রামের অন্য সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও তার ভিটে আজ নিশ্চিহ্ন। কিন্তু হঠাৎ সে লক্ষ করে তার ছোট বেলার স্মৃতি-বিজড়িত সেই আম গাছটি এখনও আছে। সেই আম গাছের ছায়াতলে বসে ক্লান্ত-শ্রান্ত উপেন পরম শান্তি অনুভব করে। তার মনে পড়ে, ঝড়ের দিনে কত না আম সে কুড়িয়েছে এখানে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম পড়ে তার কোলের কাছে। আম দুটিকে সে জননীর স্নেহের দান মনে করে গ্রহণ করে। কিন্তু তখনই ছুটে আসে মালি। উপেনকে সে আম-চোর বলে গালাগালি করতে থাকে। উপেনকে জমিদারের নিকট হাজির করা হয়। উপেন জমিদারের কাছে আম ভিক্ষা হিসেবে চাইলে জমিদার তাকে সাধুবেশী চোর বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

এই কবিতার মাধ্যমে কবি দেখাতে চেয়েছেন, সমাজে এক শ্রেণির লুটেরা বিত্তবান প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করে। তারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে সম্পদশালী হয়। তারা অর্থ, শক্তি ও দাপটের জোরে অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে কবি এদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

কবি-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, বিশ্বনন্দিত কবি। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশোনায় তাঁর মন বসেনি। পড়াশোনার জন্য তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি—এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শেষ করার আগেই তিনি সেসব ছেড়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। সাহিত্যের সকল শাখায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। কবিতা, সংগীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ, উজ্জ্বল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, গীতিকার, সুরকার, শিক্ষাবিদ, চিত্রশিল্পী, নাট্য-প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত কবিতা-সংকলন 'গীতাঞ্জলি'র জন্য তিনি

এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' তাঁরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. কবিতাটি তোমার নিজস্ব ভাষায় গল্পে, নাটিকায় বা বর্ণনাধর্মী গদ্যে রূপায়িত করো।
খ. তোমার জানা কোনো কৃষকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনি লিপিবদ্ধ করো (একক কাজ)।
গ. কবিতাটির নাট্যরূপ দাও এবং শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দুই বিঘা জমি' কোন ধরনের কবিতা?

ক. কাহিনি-কবিতা খ. গীতিকবিতা
গ. চতুর্দশপদী কবিতা ঘ. স্বদেশপ্রেমের কবিতা

২. 'সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম'—পঙ্ক্তিটিতে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. স্মৃতিকাতরতা
ii. স্পর্শকাতরতা
iii. অনুদারতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৩. বাবু সাহেবের সম্পত্তি-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে যে চরণে, তা হচ্ছে–

i. বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে
ii. পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা
iii. এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাজিব সাহেব এক যুগ আগে আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন। কিন্তু তারপরও তার মনে সুখ নেই। সেখানকার পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষজন কোনো কিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। সারাক্ষণ মনটা পড়ে থাকে আঁকা-বাঁকা মেঠো পথের ধারের কুঁড়েঘরে, যেখানে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোরের সোনালি সময়।

৪. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের মানসিকতায় 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?

ক. স্বদেশপ্রীতি খ. প্রকৃতিপ্রীতি

গ. স্বাজাত্যপ্রীতি ঘ. মর্তপ্রীতি

৫. উক্ত অনুভূতি নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?

ক. চেয়ে দেখো মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।

খ. কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।

গ. কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি ক্ষুধাহরা সুধারাশি।

ঘ. তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে, সেই দুই বিঘা জমি।

সৃজনশীল প্রশ্ন

গাজীপুর চৌরাস্তার কাছে মতিন মিয়ার ছোট্ট এক চায়ের দোকান। আর দোকানের পাশেই 'ক' হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে। একদিন সকালে মতিন দেখে, তার দোকান অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। সে বুঝে গেল আর কিছুই করার নেই। উপায়ান্তর না দেখে সে রাস্তায় রাস্তায় ফ্লাস্কে করে চা বিক্রি করে সংসার চালায় আর উদাস দৃষ্টিতে গগনচুম্বি অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?

খ. 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. 'ক' হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের মতিন 'দুই বিঘা জমি'র শোষিত উপেনের সার্থক প্রতিনিধি কি না, সে বিষয়ে তোমার মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করো।

পাছে লোকে কিছু বলে

কামিনী রায়

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

হৃদয়ে বুদবুদ মতো
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি
নির্মল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যাই উপেক্ষার ছলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

বিধাতা দিছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ;
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

শব্দার্থ ও টীকা

সদা	— সবসময়।
সংশয়	— সন্দেহ, দ্বিধা।
সংকল্প	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা।
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে	— মনের দৃঢ় ইচ্ছা পূরণ করায় বাধা তৈরি হয়।
শুভ্র	— সাদা, এখানে পরিষ্কার বা অমলিন অর্থে ব্যবহৃত।
যবে	— যখন।
প্রশমিতে	— উপশম ঘটাতে, নিবারণ করতে।
প্রশমিতে পারে ব্যথা	— যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে।
উপেক্ষা	— গ্রাহ্য না করা, অবহেলা করা, গুরুত্ব না দেওয়া।
ছল	— ছুতা, ওজর।
ম্রিয়মাণ	— কাতর, বিষাদগ্রস্ত।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ নেওয়া হয়েছে। কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ অনেক সময় দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই ভেবে তারা বসে থাকে। এর ফলে কাজ এগোয় না। যাঁরা সমাজে অবদান রাখতে চান তাঁদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়-ভীতি-সংকোচ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।

কবি-পরিচিতি

কামিনী রায় বরিশালের বাসন্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৮৮৬ সালে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করে তিনি ওই কলেজেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। আনন্দ ও বেদনার সহজ-সরল প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। মানবতাবোধ ও নৈতিকতাকেও তিনি তাঁর কবিতার বিষয় করেছেন। তাঁর লেখা ছোটদের কবিতাসংগ্রহের নাম 'গুঞ্জন'। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ – 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'দীপ ও ধূপ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'পাছে লোকে কিছু বলে' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তোমার কিংবা তোমার পরিচিত লোকজনের সমস্যা নিয়ে গল্প, নাটিকা বা প্রবন্ধ রচনা কর (একক কাজ)।

খ. তোমার ভিতরকার তিনটি সমস্যা খুঁজে বের করো এবং এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসার উপায় লেখ (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহৎ কাজ সম্পাদনে কোনটিকে উপেক্ষা করা অনুচিত?

ক. সংকোচ খ. সংশয়

গ. সংকল্প ঘ. বাধা

২. আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ কেন উপেক্ষা করে চলে যান?

ক. রোগাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে খ. সমালোচনার ভয়ে

গ. সহযোগিতার ভয়ে ঘ. ছোট হওয়ার ভয়ে

৩. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি পাঠকের মধ্যে কোন ধরনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ?

ক. ভয়হীনতা খ. পরোপকারিতা

গ. সাহসিকতা ঘ. সংকোচহীনতা

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাসুদ গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। সে ভাবে এক সময় প্রচুর আয় হবে, বেকাররা স্বনির্ভর হবে। কিন্তু যদি সে এ কাজে সফল হতে না পারে, তাহলে লোকে তার সমালোচনা করবে। তাই সে তার পরিকল্পনা বাদ দেয়।

৪. উদ্দীপকের মাসুদের মাঝে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন বিশেষ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

ক. ভীরুতা খ. সংশয়
গ. হতাশা ঘ. দুর্বলতা

৫. কামিনী রায়ের দৃষ্টিতেই মাসুদের এ উদ্যোগ সফল করা যেতে পারে—

i. দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলে
ii. সকল সংশয় দূর করলে
iii. সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

২. 'নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।'

ক. 'প্রশমিতে' শব্দটির অর্থ কী?
খ. 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে'– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্য 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন স্তবকের বিপরীত ভাব ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের নিন্দুক ও 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার নিন্দুকের তুলনামূলক আলোচনা করো।

প্রার্থনা

কায়কোবাদ

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কী দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলি নি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর পথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণগানে,
আনন্দে বিহ্বল!
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফল!
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকানল!
দেহ হৃদে বল!

(সংক্ষেপিত)

শব্দার্থ ও টীকা

প্রার্থনা	–	মুনাজাত, আবেদন।
বিভো	–	বিভু, স্রষ্টা, এখানে 'বিভো' বলে কবি স্রষ্টাকে সম্বোধন করেছেন।
রিক্ত করে	–	শূন্য হাতে।
পেষণে	–	অত্যাচারে।
ক্রোড়	–	কোল।
পল	–	মুহূর্তকাল, নিমেষ।
অশেষ	–	যার শেষ নেই, অন্তহীন।
বিষাদ	–	বিষণ্ণতা, দুঃখবোধ।
স্মরিলে	–	স্মরণ করলে, মনে করলে।
প্রসাদ	–	অনুগ্রহ।
হৃদে	–	হৃদয়ে, মনে।
বল	–	শক্তি, জোর।
স্তুতি	–	প্রশংসা।
আরতি	–	প্রার্থনা।
চারু	–	সুন্দর।
নিকুঞ্জ	–	বাগান।
শোকানল	–	শোকরূপ অনল, যে শোক হৃদয়কে দগ্ধ করে।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে এবং সমগ্র সৃষ্টি যে স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত তা উপলব্ধি করবে। তারা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রার্থনা' কবিতাটি কবির 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। কবি এ কবিতায় স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে, আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সব কিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে

তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা রিক্ত হস্তে পরম ভক্তি ভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই : হে প্রভু, আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার আরাধনায় নিজেকে নিবেদন করতে পারি।

কবি-পরিচিতি

কায়কোবাদ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি ডাকবিভাগে চাকরি নেন। অনেক দিন ধরে তিনি নিজগ্রাম আগলাতে পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। তারপর আপন স্বভাবে তিনি ক্রমাগত লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'মহাশ্মশান' বিখ্যাত মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'অশ্রুমালা', 'শিবমন্দির', 'অমিয়ধারা', 'মহররম শরীফ' ইত্যাদি। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কবি বিধাতাকে কী বলে স্তুতি জানিয়েছেন?

ক. পথের সম্বল খ. চারু ফুল ফল

গ. দেহে হৃদে বল ঘ. অশেষ মঙ্গল

২। কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. দরিদ্র্য খ. দারিদ্র্য

গ. দারিদ্র্যতা ঘ. দারিদ্রতা

৩। 'নিকুঞ্জ' শব্দটির অর্থ কী?

ক. কুঞ্জলতা খ. ফুলদল

গ. বাগান ঘ. মঞ্জরি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নত্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

ক. স্তুতি কথার অর্থ কী?

খ. 'তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'প্রার্থনা' কবিতার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করলেও সমগ্রভাব প্রকাশে সক্ষম নয় — যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

বাবুরের মহত্ত্ব

কালিদাস রায়

পাঠান-বাদশা লোদি
পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহিগদি,
দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি।
গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, 'জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।
লয়ে লুণ্ঠিত ধন
দেশে ফিরে যাও, নতুবা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'
খানুয়ার প্রান্তরে
সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন-অতীত, যেন বা দৈব বলে
সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।
দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।
চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান
করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কুর্তার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে
দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঁড়ায়ে যুবক দিল্লির পথ-পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।
হেন কালে এক মত্ত হস্তী ছুটিল পথের পরে
পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।
সকলেই গেল সরি
কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ি।

হাতির পায়ের চাপে
'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।
'কুড়াইয়া আন ওরে'
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করী-শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।
চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।
বলিয়া উঠিল এক জন,'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে-আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?
খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,
ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান।'
শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে
বক্ষে চাপিয়া চুমু দেয় তার মুখে।
বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,
এ যে বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।
ভাবিতে লাগিল, 'হরিতে ইহারই প্রাণ
পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?
বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে
কহিল সঁপিয়া গুপ্ত কৃপাণ বাবুরের করপুটে,–
'জাঁহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ
করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ
সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।
বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়,
ভারতভূমির যোগ্য পালক যেবা,
তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'
রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে
কহিল বাবুর ধীরে,
'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে:
জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে
আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও;
প্রাণরক্ষকই হইবে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।'

শব্দার্থ ও টীকা

হত	–	নিহত।
শাহিগদি	–	বাদশার গদি, সিংহাসন।
জিনিতে	–	জয় করতে।
রণ	–	যুদ্ধ।
প্রান্তর	–	বিস্তৃত মাঠ, ময়দান।
স্বপ্ন-অতীত	–	স্বপ্নের অতীত, যা স্বপ্নেও দেখা যায় না, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়।
করতল	–	হাতের তালু।
প্রতিরোধ	–	বাধা।
তুষ্ট	–	তৃপ্ত , আনন্দিত, খুশি।
মসনদ	–	সিংহাসন, রাজাসন।
করী-শুন্ড	–	হাতির শুঁড়।
বে-আকুফ	–	নির্বোধ।
পর্যটক	–	ভ্রমণকারী।
কৃপাণ	–	ছোট তরবারি, খড়্গ
বসুধা	–	পৃথিবী।
ঘাতক	–	হত্যাকারী।
দন্ডবিধান	–	শাস্তি প্রদান।

বাবুর- ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। তাঁর আসল নাম জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ। তবে তিনি 'বাবুর' বা 'সিংহ' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অল্প বয়সেই দু'বার সিংহাসন হারান। তারপর তিনি নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পরে ভারতের ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে তিনি পরাজিত করেন। এভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বাবুর।

পাঠান বাদশা লোদি– ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান-সম্রাট সুলতান ইব্রাহিম লোদি।

পানিপথ– দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম সিংহ– রাজপুতানার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহ। তিনি খানুয়ার প্রান্তরে বাবুরের কাছে পরাজিত হন।

খানুয়ার প্রান্তর– আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।

কৃতঘ্ন দৌলত– বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন। তিনি নিজের দুশমন ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। পরে তিনি বাবুরের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

চিতোর– রাজপুতানার মেবার রাজ্যের রাজধানী।

রণবীর চৌহান– রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখার নাম চৌহান। যে স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাকে বলা হয়েছে 'রণবীর চৌহান'।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় মুঘলসম্রাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজা সাধারণের হৃদয় জয়ে মনোযোগী হলেন। রাজপুতগণ তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজপুত-বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘুরছিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে-থাকা একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। মহৎপ্রাণ বাবুর তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেন।

কবি-পরিচিতি

কালিদাস রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে তিনি আদর্শ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিচিত্র বিষয়ের ওপর কবিতা লিখেছেন। তিনি বেশ কিছুসংখ্যক কাহিনি-কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কবি হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। কালিদাস রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্য : 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ঋতুমঙ্গল', 'রসকদম্ব' ইত্যাদি। তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. কিশলয় খ. পর্ণপুট

গ. ঋতুমঙ্গল ঘ. বৈকালী

২. 'জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।'– কে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল?

ক. চৌহান
খ. সংগ্রাম সিং
গ. দৌলত খাঁ
ঘ. ইব্রাহিম লোদি

৩. 'বীরভোগ্যা এ বসুধা'–এ কথার অর্থ কী?

ক. বীরপুরুষেরাই এ পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়ে থাকেন।
খ. বীরপুরুষগণই পৃথিবীতে কীর্তি স্থাপন করে থাকেন।
গ. বীরগণ পৃথিবীকে বেশি ভোগ করেন।
ঘ. এ পৃথিবীতে বীরের অধিকারই স্বীকৃত।

৪. বাবুরের মহত্ত্ব কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবুরের–

i. ক্ষমাশীলতা
ii. বীরত্ব
iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. iii
ঘ i, ii ও iii

নিচের চরণ দুটো পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'

৫. কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর, – কার প্রতিহিংসার ঘোর কেটেছে?

ক. চৌহানের
খ. সংগ্রাম সিং-এর
গ. দৌলত খাঁ-এর
ঘ. ইব্রাহিম লোদির

৬. 'করুন এখন দণ্ডবিধান মোর'– কিসের দণ্ডবিধানের কথা এখানে বলা হয়েছে?

i. প্রতিহিংসার
ii. অন্ধ মোহের
iii. অপরাধের

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. iii
ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. প্রচণ্ড বন্যায় ডুবে যায় টাঙ্গাইলের ব্যাপক অঞ্চল। অনেকেরই ঘরবাড়ি ডুবে যায়। নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে অগণিত মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এমনি একটা পরিবার নৌকায় চড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে। তীব্র স্রোতের টানে নৌকাটি উল্টে গেলে সবাই সাঁতার কেটে উঠে এলেও জলে ডুবে যায় একটি শিশু। বড় মিয়া নামের এক যুবক এ দৃশ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন শিশুটিকে। কূলে উঠে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন বড় মিয়া আর বেঁচে নেই।

ক. রণবীর চৌহান কে ছিলেন?

খ. 'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে ' কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বড় মিয়ার আচরণে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার একটা বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটলেও সমভাব ধারণ করে না – যুক্তিসহ বুঝিয়ে লেখো।

২. "বাঁচিতে চাই না আর
জীবন আমার সঁপিলাম, পীর, পূত পদে আপনার।
ইব্রাহিমের গুপ্তঘাতক আমি ছাড়া কেউ নয়,
ঐ অসিখানা এ বুকে হানুন সত্যের হোক জয়।"

ক. বাবুরের আসল নাম কী?

খ. 'সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর'।– উক্তিটি কার, কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ইব্রাহিমের গুপ্তঘাতকের সাথে 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বর্ণিত রাজপুত বীরের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতার সমগ্র ভাব প্রকাশে কতটুকু সক্ষম তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বল।

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না কো, নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই!

[সংক্ষেপিত]

শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য	— সমতা, সমান অধিকার।
অশ্রুবারি	— চোখের জল।
ভগ্নি	— বোন।
মহীয়ান	— সুমহান, এখানে মহিমান্বিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
রণ	— যুদ্ধ, লড়াই।
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর	— অসংখ্য নারী স্বামীকে হারিয়েছে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি	— হৃদয়ভরা মমতা দিয়ে উৎসাহিত করল নারী।
স্মৃতিস্তম্ভ	— স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি কাঠামো।
বিজয়-লক্ষ্মী নারী	— জয়ের নিয়ন্তা দেবী হিসেবে নারীকে কল্পনা করা হয়েছে।
ডঙ্কা	— জয়ঢাক।
রচা	— রচনা করা হয়েছে এমন, সৃষ্টি করা হয়েছে এমন।
পীড়ন	— অত্যাচার, নির্যাতন, শারীরিক কষ্ট প্রদান।
পীড়া	— যন্ত্রণা, কষ্ট, বেদনা।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মানব সভ্যতায় নারীর অবদান যে পুরুষের চেয়ে কম নয় তা জেনে নারীর অধিকারের প্রতি সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'নারী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। সাম্যবাদী কবি নর-নারী উভয়কেই মানুষ হিসেবে দেখেন। তিনি জগতে নর ও নারীর সাম্য বা সমান অধিকারে আস্থাবান। তাঁর মতে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের অবদান সমান। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের অবদান যতটা লেখা হয়েছে নারীর অবদান ততটা লেখা হয় নি। কিন্তু এখন দিন এসেছে সম অধিকারের। তাই নারীর ওপর নির্যাতন চলবে না, তাঁর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা চলবে না। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে সম্মিলিতভাবে।

কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেন নি। দশম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। তাঁর রচনাবলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প— সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। তিনি সাম্যবাদী চেতনাভিত্তিক কবিতা, শ্যামাসংগীত, ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা

পেয়েছেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তার সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে কবিকে সপরিবার ঢাকায় আনা হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং একুশে পদক পান। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, কাব্যগ্রন্থ: 'অগ্নি-বীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক'; উপন্যাস : 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা'; গল্পগ্রন্থ : 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' 'শিউলিমালা' ; প্রবন্ধগ্রন্থ : 'যুগবাণী', 'রুদ্র-মঙ্গল'; নাটক : 'ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'মধুমালা' ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার পরিচিতজনদের মধ্যে এমন কোনো নারীর জীবনালেখ্য রচনা করো, যার কর্মজগৎ নিয়ে তুমি গর্ব করতে পার (একক কাজ)।

খ. নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য তোমার সহপাঠীদের মধ্যে একটি গবেষণা চালাতে পার। এর জন্য শিক্ষকের সহযোগিতায় প্রথমেই প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। যেমন— ১. সংসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কে? উত্তর হতে পারে নারী, পুরুষ, অথবা উভয়ই।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৯১৯ খ. ১৯৭২

গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

২. বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে কোনটি লেখা নেই?

ক. বোনের সেবা খ. নারীর সিঁথির সিঁদুর

গ. ভগ্নির আত্মত্যাগ ঘ. বধূদের আত্মত্যাগ

৩. 'পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই'—চরণটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রবাদবাক্য—

i. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়

ii. যেমন কর্ম তেমন ফল

iii. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

লোকশিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া জীবিকার তাগিদে কোদাল-টুকরি নিয়ে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কাটেন। দিন শেষে মজুরি নিতে গিয়ে দেখেন পুরুষ শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে দু শ টাকা আর তাকে দেওয়া হলো একশ টাকা। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে মালিক বলে— এটাই নিয়ম।

৪. প্রদত্ত উদ্দীপকটির সাথে 'নারী' কবিতার ভাবগত ঐক্যের দিকটি হলো—

i. বৈষম্য

ii. শোষণ

iii. সাম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. উদ্দীপকের ভাব নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?

ক. অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর

খ. কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে

গ. বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি

ঘ. কোন কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নারীদের প্রেরণাদায়ক একটি নাম আনোয়ারা। একজন নারী হয়ে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচন- সংক্রান্ত কাজ করেছেন। সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞ তিনি কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করেছেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে তিনি অন্য পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। নারী বলে কোথাও তাকে সমস্যায় পড়তে হয় নি।

ক. 'নারী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

খ. কবি বর্তমান সময়কে 'বেদনার যুগ' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

গ. আনোয়ারার কার্যক্রমে 'নারী' কবিতার যে দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকে কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুভূতির প্রতিফলন ঘটলেও 'নারী' কবিতায় কবি আরও বেশি বাঙ্ময়— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

২. জনৈক সমালোচকের মতে— ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গীয় মুসলমান নারীসমাজ ছিল অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধি- নিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ। নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও সামাজিক ভেদ-বুদ্ধিও ছিল তাদের জন্য নিয়তির মতো সত্য। অবরুদ্ধ জীবন-যাপনে অত্যন্ত এক অসহায় জীবে তারা পরিণত হয়েছিলেন। এদেরকে আলোর জগতে আনার জন্য রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য— 'আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীভাবে? কোনো এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই।'

ক. 'বিজয়-লক্ষ্মী নারী'– অর্থ কী?

খ. 'সাম্যের গান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. জনৈক সমালোচকের মতটি 'নারী' কবিতার কোন দিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ—ব্যাখ্যা করো।

ঘ. বেগম রোকেয়ার বক্তব্য যেন কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতারই প্রতিধ্বনি—উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো— কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;— রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

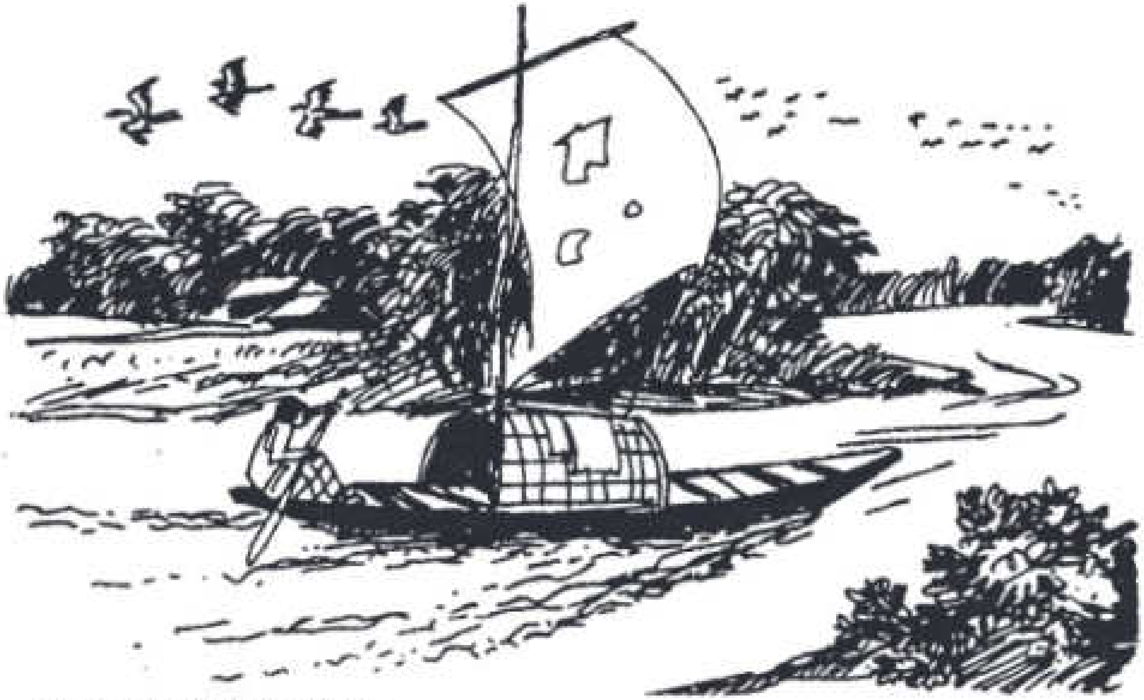

শব্দার্থ ও টীকা

ধানসিঁড়ি	— ঝালকাঠি জেলার একটি নদী। নদীটি এখন মরে গেছে।
শঙ্খচিল	— এক ধরনের সাদা চিল।
নবান্ন	— নতুন ধানকাটার পর আমাদের দেশে এ উৎসব হয়। এ উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়।
কার্তিকের নবান্নের দেশে	— কবি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে নবান্নের দেশ বলেছেন। নবান্ন অর্থ নতুন ভাত। কার্তিক মাসে ঘরে নতুন ধান তুলে কৃষকেরা নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে।
ঘুঙুর	— নূপুর, পায়ের অলংকার।
জলাঙ্গী	— কবি এখানে নদীকে জলাঙ্গী (অর্থাৎ জল যার অঙ্গে) নামে অভিহিত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে কবি জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা বলেছেন।
ডাঙা	— জলাশয়ের নিকটবর্তী উঁচু স্থান।
সুদর্শন	— শকুনি; এক ধরনের পোকা যা উড়তে পারে।
লক্ষ্মীপেঁচা	— এক ধরনের পেঁচা।
রূপসা	— একটি নদীর নাম।
ডিঙা	— ছোট নৌকা।
নীড়ে	— পাখির বাসায়।
ধবল	— সাদা।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে।

পাঠ-পরিচিতি

'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস কবির দৃষ্টিতে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে কবিতায়। কবি মনে করেন, যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন দেশের সঙ্গে তাঁর মমতার বাঁধন শেষ হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের খেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনও বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে, তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা বিলের পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল ঘেঁষে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

কবি-পরিচিতি

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামযশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়গপুর কলেজ, বরিষা কলেজ ও হাওড়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। এক সময় তিনি সাংবাদিকতার পেশাও অবলম্বন করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির রং ও রূপের বৈচিত্র্য প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু-পাখি ও লতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে। প্রকৃতিপ্রেমিক এই কবি প্রকৃতি থেকেই তাঁর কবিতার রূপরস সংগ্রহ করেছেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালে কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. কবিতাটির দৃশ্যচিত্র অবলম্বনে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করো (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে)।

খ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি অবলম্বনে একক ও দলগত আবৃত্তির আয়োজন করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধানসিঁড়ি কিসের নাম?

ক. নদীর   খ. শহরের
গ. ধানের   ঘ. গ্রামের

২. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি   খ. রূপসী বাংলা
গ. ঝরাপালক   ঘ. বনলতা সেন

৩. 'সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে'—এখানে সারাদিন কেটে যাবে কার?

ক. হাঁসের   খ. কিশোরীর
গ. কাকের   ঘ. কবির

কবিতাংশটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

'গোধূলি লগনে জগদীশে স্মরণে
বিদায় লইব জনমের তরে
লুকাইব আমি সন্ধ্যার আঁধারে বাংলা মায়ের ক্রোড়ে।'

৪. উদ্দীপকে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

ক. স্বদেশচেতনা   খ. মৃত্যুচেতনা
গ. প্রকৃতিচেতনা   ঘ. ধর্মচেতনা

৫. উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে নিচের কোন চরণে?

i. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়

ii. হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে

iii. আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পল্লির সন্তান অমিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ফ্রান্স যায়। সেখানকার সুপ্রশস্ত রাজপথ, উদ্যান, নির্মল প্রকৃতি তার খুব ভালো লাগে। রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বাস-স্টপেজ সব জায়গায় দেশি-বিদেশি স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে ফরাসিদের দেশপ্রেম দেখে সে বিস্মিত হয়। ওদের ক্যাফে, মিউজিয়াম সবকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে অমিত স্থায়িভাবে সেখানে থেকে যায়। তার অতীত স্মৃতি ফরাসি সৌন্দর্যের মোহে ক্রমশ ধূসর হয়ে যায়।

ক. উঠানে খইয়ের ধান ছড়ায় কে?

খ. মানুষ না হয়ে 'শঙ্খচিল শালিকের বেশে, জীবনানন্দ দাশ এদেশে ফিরতে চান কেন?

গ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় উদ্দীপকের ফরাসি জাতির কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে? বর্ণনা করো।

ঘ. অমিতের অনুভূতি আর জীবনানন্দ দাশের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

২. 'বাংলার হাওয়া বাংলার জল
হৃদয় আমার করে সুশীতল
এত সুখ শান্তি এত পরিমল
কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া।'

ক. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

খ. 'বাংলার সবুজ করুণ ডাঙা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপক অবলম্বনে 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

ঘ. 'কোথা পাব আর বাংলা ছাড়া'—কথাটির সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের বাংলায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে সম্পর্কিত— আলোচনা করো।

রূপাই

জসীমউদ্‌দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার'
রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো-বরন চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠেরি ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দি-বেত' যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই, রূপার চেয়ে দামি,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি।

শব্দার্থ ও টীকা

ভ্রমর	—	ভোমরা, ভিমরুল।
নবীন তৃণ	—	কচি ঘাস।
জালি	—	কচি, সদ্য অঙ্কুরিত।
শাওন	—	শ্রাবণ, বঙ্গাব্দের চতুর্থ মাসের নাম।
কালো দত	—	লেখার কালি রাখার পাত্র বিশেষ, দোয়াত।
গরব	—	গর্ব, অহংকার।
রামধনুকের হার	—	অর্ধবৃত্তাকার রংধনুকে গলার হার হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
পদ-রজ	—	পায়ের ধুলা, চরণধূলি।
বৃন্দাবন	—	মথুরার নিকটবর্তী হিন্দুদের তীর্থস্থান।
সিনান	—	স্নান, গোসল।
উজল	—	উজ্জ্বল, দীপ্তিমান।
আখড়াতে	—	নৃত্যগীত শিক্ষা ও মল্লবিদ্যা অভ্যাসের স্থান।
শাল-সুন্দি-বেত	—	শাল অর্থ শালগাছ বা মূল্যবান কাঠ, সুন্দি এক প্রকারের বেত। একত্রে বিবিধ কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ। কবিতায় রূপাইকে এমনই উপকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে।
জারি গান	—	শোকগীতি; কারবালার শোকাবহ ঘটনামূলক গাথা।
পাগাল	—	ইস্পাত। পাগাল লোহা বলতে ইস্পাতসম কঠিন লোহাকে বোঝানো হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে। তারা গ্রামীণ সৌন্দর্য সম্পর্কেও অবহিত হবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রামীণ কৃষকের শৈল্পিক রূপ অনুধাবনও করতে পারবে।

পাঠ-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নক্সী কাঁথার মাঠ' নামক কাহিনিকাব্যের এ অংশটুকু 'রূপাই' কবিতা নামে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, কৃষকের রূপ ও কর্মোদ্যোগ অসাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। গ্রামবাংলার প্রকৃতির মধ্যে কালো ভ্রমর, রঙিন ফুল, কাঁচা ধানের পাতা এবং কচি মুখের মায়াবী কৃষককে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। কৃষকের বাহু লাউয়ের কচি ডগার মতো বলে মনে হয়।

রোদে পুড়ে কৃষকের শরীরের রং কালো হয়ে যায়। কালো কালি দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত কেতাব বা গ্রন্থ

২০২৫

লেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবির মতে, রাখাল ছেলের কালো রং মোটেই খারাপ কিছু নয়।

কালো কৃষকটি আখড়াতে বা জারির গানে যেমন দক্ষ তেমনি সকল কাজে পারদর্শী। তাই কবির দৃষ্টিতে এ কৃষক সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে।

কবি-পরিচিতি

কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি পাঁচ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি সরকারের তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগ দেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'কবর' কবিতাটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর কবিতায় পল্লির মানুষ ও প্রকৃতির সহজ-সুন্দর রূপটি দেখতে পাওয়া যায়। পল্লির মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাহিনিকাব্য : 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'; কাব্যগ্রন্থ : 'রাখালী', 'বালুচর', 'মাটির কান্না'; নাটক : 'বেদের মেয়ে'; উপন্যাস : 'বোবা কাহিনী' ; গানের সংকলন : 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : 'হাসু', 'এক পয়সার বাঁশী', 'ডালিমকুমার'। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রি এবং বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'রূপাই' কবিতা অবলম্বনে একজন গ্রামীণ কৃষকের চরিত্রে অভিনয় করে দেখাও (একক কাজ)।

খ. তোমাদের সংগৃহীত গ্রামীণ ছড়া বা লোকছড়া শ্রেণিতে প্রদর্শনের আয়োজন করো (দলগত কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রূপাই' কবিতাটি পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

ক. রাখালী খ. নক্সী কাঁথার মাঠ

গ. সোজন বাদিয়ার ঘাট ঘ. বালুচর

২. কবি চাষির ছেলের বাহুকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

ক. কাঁচা ধানের পাতা খ. জালি লাউয়ের ডগা

১০৮ গ. শাওন মাসের তমাল তরু ঘ. কচি ধানের চারা

৩. 'কালো দতের কালি দিয়ে কেতাব কোরান লিখি'—চরণটির 'কালো দত' বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো:

i. লেখার কালি রাখার পাত্রবিশেষ
ii. কালো দন্তবিশেষ
iii. দোয়াত

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভোরের প্রকৃতিতে শিশিরে ভেজা কচি ঘাসের হালকা সবুজ রং আমাদের আকর্ষণ করে। মনে হয়, সবুজ ঘাস এক মায়াময় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ ছায়া আমাদের মনে কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করে।

৪. উদ্দীপকের সাথে 'রুপাই' কবিতার যে-চরণটির মিল পাওয়া যায় তা হলো:

ক. কাঁচা ধানের পাতার মতো কচিমুখের মায়া
খ. তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া
গ. জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু
ঘ. কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত কোনো চাষি

৫. উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতায় কবির কোন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়?

ক. প্রকৃতিপ্রীতি খ. মর্ত্যপ্রীতি
গ. কৃষকপ্রীতি ঘ. মানবপ্রীতি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পল্লিগ্রামের পিতৃহীন এক দুরন্ত বালক ছমির শেখ। ফসল বোনার ওস্তাদিতে দশগ্রামে তার সুনাম আছে। বন্যা-খরা তথা গ্রামের শত বিপদে বৃক্ষের ছায়ার মতো তাকে সবাই কাছে পায়। যাত্রাপালার অভিনয়ে তার জুড়ি মেলা ভার। গ্রামের সবাই তাকে স্নেহ করে, যেমন প্রকৃতি করে গ্রামকে।

ক. চাষির ছেলের 'গা-খানি' দেখতে কেমন?
খ. "চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়"– চরণটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপক ও 'রুপাই' কবিতার আলোকে তোমার দেখা কোনো পল্লিগ্রামের বর্ণনা দাও।
ঘ. 'উদ্দীপকটি 'রুপাই' কবিতার মূল ভাবের খণ্ডাংশ মাত্র'– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।

নদীর স্বপ্ন

বুদ্ধদেব বসু

কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!
দুটো কথা শোনো দিকি,
এই নাও — এই চকচকে, ছোটো,
নতুন রুপোর সিকি।
ছোকানুর কাছে দুটো আনি আছে,
তোমায় দিচ্ছি তাও,
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে
নৌকায় তুলে নাও।
নৌকা তোমার ঘাটে বাঁধা আছে —
যাবে কি অনেক দূরে?
পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো
মোরে আর ছোকানুরে।
আমারে চেনো না? আমি যে কানাই।
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোণ।
শোনো, মা এখন ঘুমিয়ে আছেন,
দিদি গেছে ইশকুলে,
এই ফাঁকে মোরে — আর ছোকানুরে —
নৌকোয় নাও তুলে।
কোনো ভয় নেই — বাবার বকুনি
তোমায় হবে না খেতে,
যত দোষ সব আমরা — না, আমি
একা নেবো মাথা পেতে।

ওটা কী? জেলের নৌকা? — তাই তো!
জাল টেনে তোলা দায়,
রুপোলি নদীর রুপোলি ইলিশ —
ইশ, চোখে ঝলসায়!

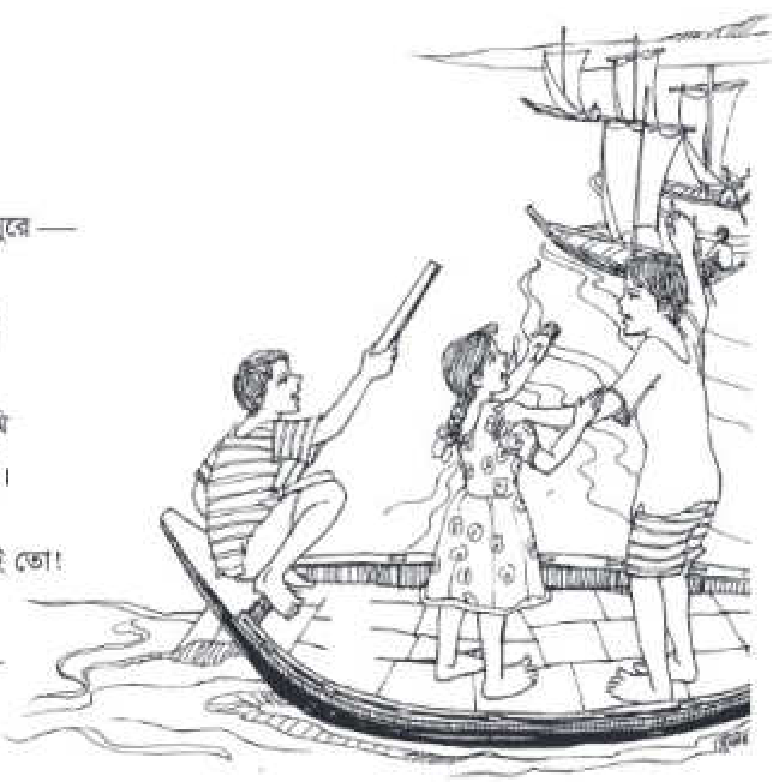

ইলিশ কিনলে? — আঃ, বেশ, বেশ,
তুমি খুব ভালো, মাঝি।
উনুন ধরাও, ছোকানু দেখাক
রান্নার কারসাজি।
পইঠায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত,
টাটকা ইলিশ-ভাজা —
ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি,
আমি পদ্মার রাজা।

খাওয়া হলো শেষ, আবার চলছি
দুলছে ছোট্ট নাও,
হালকা নরম হাওয়ায় তোমার
লাল পাল তুলে দাও।
ছোকানুর চোখ ঘুমে ঢুলে আসে
আমি ঠিক জেগে আছি,
গান গাওয়া হলে আমায় অনেক
গল্প বলবে, মাঝি?
শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই
বিছানা বালিশ বিনা —
মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই,
ও বড়োই ভীতু কিনা।
আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না
আমি তো বড়োই প্রায়
ঝড় এলে ডেকো আমারে — ছোকানু
যেন সুখে ঘুম যায়।

[অংশবিশেষ]

শব্দার্থ ও টীকা

সিকি	–	চার আনা মূল্যের মুদ্রা বা ২৫ পয়সার মুদ্রা।
আনি	–	এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যের মুদ্রা।
শোণ	–	একটি নদীর নাম।
কারসাজি	–	কূটকৌশল। এখানে চমৎকারিত্ব অর্থে কাব্যিক ব্যবহার।
পাল	–	বাতাসের সাহায্যে চালাবার জন্য নৌকায় খাটানো মোটা কাপড়ের পর্দা।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠ করার কারণে শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির প্রসার ঘটবে। প্রকৃতি ও দেশের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ভাইবোনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হবে।

পাঠ-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতায় নদী এবং নৌভ্রমণ নিয়ে এক কিশোরের কল্পনা রূপায়িত হয়েছে। দুরন্ত এক কিশোর তার ছোট বোনকে নিয়ে নৌকাতে উঠে নদীর পর নদী পার হয়ে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। নৌকার নানা রঙের পাল, নীল রঙের আকাশ, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির উড়ে চলা, রুপালি ইলিশ মাছ, নৌকায় রান্না করা, সন্ধ্যায় গান গাওয়া, গল্প করা—এত কিছু কিশোর মনে গভীর স্বপ্ন নিয়ে আসে। পাশাপাশি এ কবিতায় বোনের প্রতি ভাইয়ের দায়িত্ব ও আদর প্রকাশের চমৎকার নিদর্শন আছে।

কবি-পরিচিতি

বুদ্ধদেব বসু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনি, স্মৃতিকথা, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক (সম্মান) এবং পরের বছর প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রথমে সাংবাদিকতা এবং পরে অধ্যাপনাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। ঢাকার পুরানা পল্টন থেকে তাঁর ও অজিত দত্তের যৌথ সম্পাদনায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রগতি' (১৯২৭–১৯২৯) প্রকাশিত হয়। তিনি 'কবিতা পত্রিকা' নামেও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যরীতির বাইরে পৃথক কাব্যধারার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসুর রচনাশৈলী স্বতন্ত্র ও মনোজ্ঞ। বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর অর্থাৎ বর্তমানের মুন্সিগঞ্জে। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার ভালো লাগার স্বপ্ন নিয়ে কবিতা, গল্প বা নাটিকা রচনা করো (একক কাজ)।

খ. 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটির একটি গদ্যরূপ উপস্থাপন করো (দলগত কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না!
দুটো কথা শোনো দিকি,
চরণ দুটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
ক. আদেশ খ. নির্দেশ
গ. অনুরোধ ঘ. অনুনয়

উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কিশোর মোরা ঊষার আলো, আমরা হাওয়া দুরন্ত,
মনটি চির বাঁধন হারা, পাখির মতো উড়ন্ত।

২. উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের অর্থের সাথে নিচের কোন চরণের অর্থের মিল পাওয়া যায়?
ক. পায়ে পড়ি, মাঝি সাথে নিয়ে চলো, মোরে আর ছোকানুরে
খ. ছোকানু রে, তুই আকাশের রানি, আমি পক্ষার রাজা
গ. শুনতে শুনতে আমিও ঘুমোই – বিছানা বালিশ বিনা
ঘ. এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকানুরে, নৌকোয় নাও তুলে

৩. উক্ত পঙ্‌ক্তি দুটিতে যে আবেগ প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে—
i. কিশোর মনের উচ্ছ্বাস
ii. ভাই ও বোনের সত্যিকার মর্যাদা
iii. কল্পনার অবাধ প্রবাহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

৪. নিশু, লিজা, শ্যামা, মিথিয়া, পিয়া বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে সাগরদিঘি পাড়ে মিলিত হয়েছে। বাড়ি থেকে চাল, ডাল, ডিম, মসলা— সবকিছু নিয়ে এসেছে। জমিয়ে পিকনিক হবে। রান্নার ধুম লেগেছে। রান্না শেষ হতেই নিশুর দেখাদেখি সবাই দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাপাদাপি যেন শেষ হতেই চায় না। শেষে পিয়ার চেঁচামেচিতে সবাই এসে কলাপাতায় পাত পেড়ে খেতে বসল। খাবার মুখে দিয়েই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নুন—নুন দেওয়া হয় নি যে। আবার এক দফা হেসে নিয়ে সবাই গপাগপ খিচুড়ি খেতে শুরু করল। খুব ক্ষুধা পেয়েছে যে!

ক. দুপুরের রোদে জল কেমন করে বয়ে চলে?
খ. নৌকা-ভ্রমণের বিনিময়ে কানাই মাঝিকে আনি বা পয়সা দিতে চেয়েছিল কেন?—ব্যাখ্যা করো।
গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার কী অমিল লক্ষ করা যায়—আলোচনা করো।
ঘ. বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও কবিতাটি কিশোর মনের আবেগ প্রকাশের দিক থেকে অভিন্ন—বিশ্লেষণ করো।

জাগো তবে অরণ্য কন্যারা

সুফিয়া কামাল

মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ ম্লান।

মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ঝরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা! জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা
মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বালা!
কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।

[অংশবিশেষ]

শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি	— প্রকৃতিতে ফুল ও ফসলের সম্ভার কমে যাওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় মানুষ ভীত।
ম্লান	— মলিন।
ক্ষরিছে	— চুয়ে চুয়ে পড়ছে।
পল্লব	— গাছের নতুন পাতা। ডালের নতুন পাতাযুক্ত আগা।
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়	— মাটির মমতা রস পেয়ে বৃক্ষ শাখায় নতুন পাতা গজিয়েছে।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	— কবি বৃক্ষ-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছেন প্রকৃতিকে আবার শ্যামল সবুজে ফলে-ফুলে ভরিয়ে তোলার জন্যে।
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা	— মানুষ প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করায় বন উজাড় হচ্ছে। বৃক্ষনিধন বাড়ছে। বৃক্ষের বুকে তাই যন্ত্রণার আগুন।
মেলি লেলিহান শিখা	— কবি তরু কন্যাকে আহ্বান জানাচ্ছেন তার শাখায় শাখায় আগুন রঙা ফুল ফুটিয়ে আকাশে শাখা বিস্তার করতে।
কঙ্কণ	— কাঁকন, নারীর হাতের অলঙ্কার বিশেষ।
মুমূর্ষু	— মৃতপ্রায়। মরণাপন্ন। মরে যাচ্ছে এমন।
ধরা-প্রাণ	— পৃথিবীর জীবন।
অতন্দ্র	— তন্দ্রাহীন। ঘুমহীন। নির্ঘুম। নিদ্রাহীন।
নয়ন	— চোখ।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগে আগ্রহী হবে এবং প্রকৃতির ঐশ্বর্য রক্ষায় সচেতন হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতাটি সুফিয়া কামালের 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। প্রকৃতির রূপ-সচেতন কবি চারপাশের অরণ্য-নিধন লক্ষ্য করে ব্যথিত। তাই মৌসুমি ফুলের গান আর তার কণ্ঠে জাগে না। বরং চারপাশে সবুজ প্রকৃতির বিলীন হওয়া দেখে তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। কবি তাই অরণ্য-কন্যাদের জাগরণ প্রত্যাশা করেন। তিনি চান দিকে দিকে আবার সবুজ বৃক্ষের সমারোহের সৃষ্টি হোক; ফুলে ও ফসলে ভরে উঠুক পৃথিবী; মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা পাক বিপন্নতার হাত থেকে।

কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেই সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ছোটবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে

জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুললিত, ছন্দ ব্যঞ্জনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো : 'সাঁঝের মায়া', 'মায়া কাজল', 'মোর যাদুদের সমাধি পরে'। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'একাত্তরের ডাইরি'; শিশুদের জন্য তিনি লিখেছেন 'ইতল বিতল' ও 'নওল কিশোরের দরবারে'।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবি প্রতিভার জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেসব হলো : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পুরস্কার, মুক্তধারা ও স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. প্রকৃতিতে রক্ষার ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন উক্তি যুক্ত করে পোস্টার তৈরি করো (একক কাজ)।
খ. বাড়িতে একটি গাছ লাগাও এবং এই ছবি শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মৌসুমে ফুলের গান কার কণ্ঠে আর জাগে না?
   ক. সাধারণ মানুষের   খ. সুফিয়া কামালের
   গ. অরণ্যের   ঘ. পাখির

২. কবি কেন ব্যথিত হন ?
   ক. ফুল-ফল না থাকায়   খ. মৌসুমি গান না শোনায়
   গ. অরণ্য-নিধন লক্ষ করে   ঘ. বৃক্ষের বহ্নিজ্বালা দেখে

৩. কবি অরণ্য-কন্যাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন কেন?
   ক. পৃথিবীতে সবুজের বিস্তারের জন্য   খ. মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য
   গ. ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য   ঘ. মৌসুমি ফুল দেখার জন্য

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলছে। এ বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতিনিয়ত কমছে আবাদি জমি, বন, জঙ্গল। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা—ঘটছে পরিবেশ বিপর্যয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মফিজ খাঁ এবং আমিনা বেগম বৃক্ষমেলা থেকে প্রচুর চারা কিনে এনে এলাকার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন।

৪. উদ্দীপকে বর্ণিত বাড়তি জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যাটি 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে?
   ক. ফুল-ফলশূন্য পৃথিবী   খ. বৃক্ষ-শূন্য পৃথিবী
   গ. নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন   ঘ. বৃক্ষের সমারোহ সৃষ্টি

৫. এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতায় যে নির্দেশনা রয়েছে তা হলো—
   i. লাগাও গাছ, বাঁচাও দেশ
   ii. বৃক্ষ মাটির মুক্তিদাতা
   iii. চারিদিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি হোক

   নিচের কোনটি সঠিক?

   ক. i ও ii   খ. i ও iii
   গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. দোয়েল পাখি বাসা বেঁধেছে জবা গাছে। সোহেল তার নতুন ঘর তোলার জন্য আঙিনার অন্যান্য গাছের সাথে জবা গাছও কেটে ফেলে। দোয়েলের চোখে-মুখে বাসা হারানোর বেদনা। দোয়েল আর গান গায় না। ফুলের সাথে খেলা করে না। অন্যদিকে নিলয় তার বাড়ির আঙিনার খালি জায়গায় ফুল, ফল ও অন্যান্য গাছ লাগায়। গাছগুলোকে সে নিজের মতো ভালোবাসে। তার বাগান দেখে সকলের চোখ জুড়ায়। পাখিরা তার বাগানে চলে আসে। তারা গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন ফলের গাছ থেকে খাদ্য জোগাড় করে, ফুলের সাথে খেলা করে, গান গায়। দিনের শেষে নিশ্চিন্ত মনে বাসায় ফিরে ঘুমায়। নিলয়কে দেখে অনেকেই গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

   ক. গাছের নতুন পাতাকে কী বলে?
   খ. 'বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা' বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
   গ. দোয়েলের অভিব্যক্তিতে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।
   ঘ. 'উদ্দীপকের নিলয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কবির প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।'— বক্তব্যটির যথার্থতা দেখাও।

২. সিডরের খবর শুনে মিথিয়ার ভীষণ মন খারাপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ ঘর-বাড়ি হারা, খাবার নেই। কী ভীষণ বিপন্ন মানুষ। অথচ এর জন্য মানুষই অনেকটা দায়ী। মানুষ গাছ কেটে বন উজাড় করছে। ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে। এসব দেখে মিথিয়া অনুভব করে একটা কিছু করবে। সে তার বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির খালি আঙিনায়, ছাদে গাছ লাগানোর জন্য মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাছাড়া গাছ কেটে বন উজাড় করার বিরুদ্ধে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সে ভাবে এই সুন্দর বনই অনেক বেশি ক্ষতির হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। মিথিয়া স্বপ্ন দেখে ফুলে-ফলে ভরা সতেজ-সবুজ প্রকৃতির।

   ক. কবি সুফিয়া কামাল এখন আর কীসের গান শুনতে পান না?
   খ. 'ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
   গ. মিথিয়ার মন খারাপের বিষয়টির সাথে 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার কোন দিকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
   ঘ. 'মিথিয়া যেন কবির সেই অরণ্য-কন্যা।'—উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো।

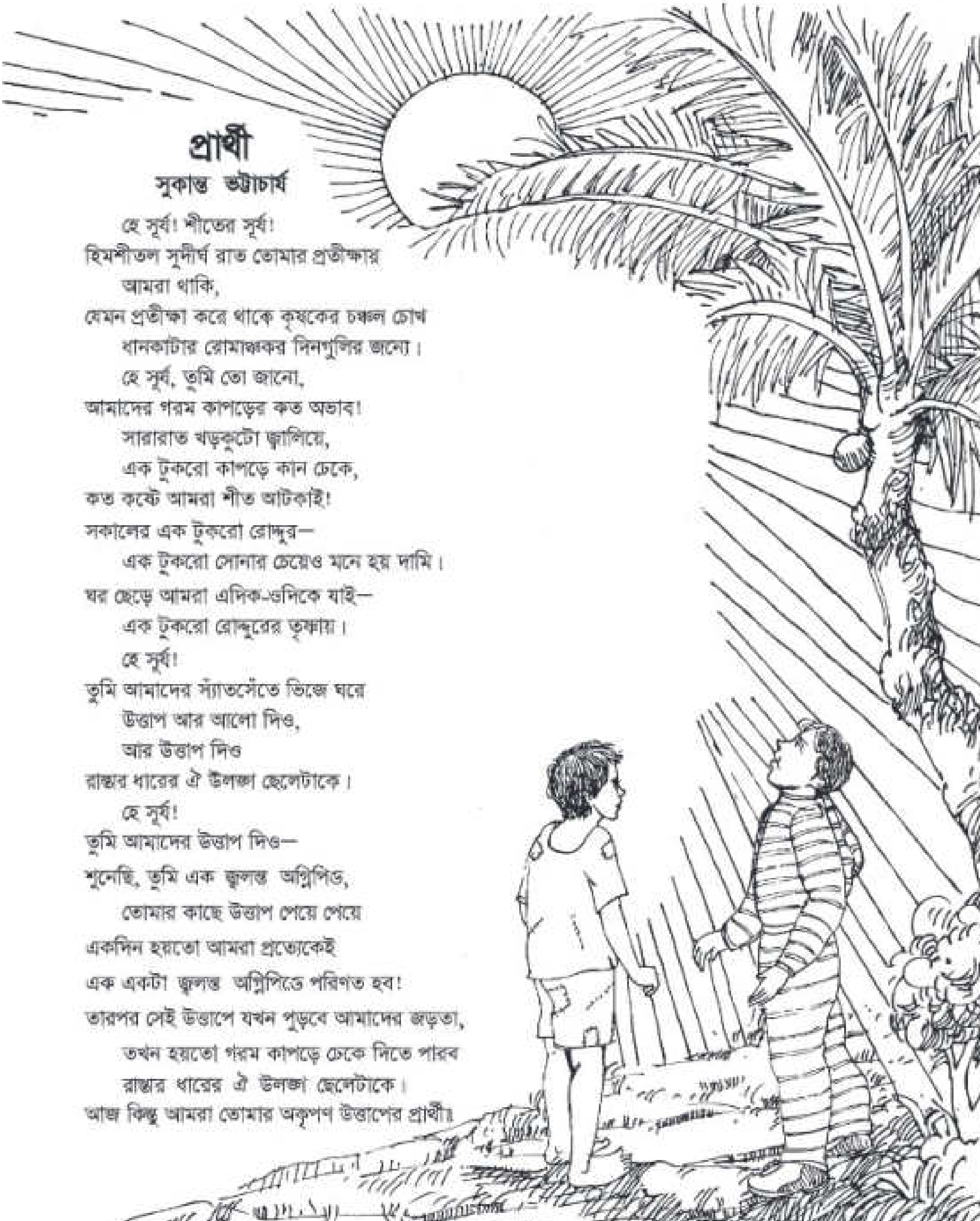

প্রার্থী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।
হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!
সকালের এক টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই—
এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।
হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রার্থী	— প্রার্থনাকারী, আবেদনকারী।
হিমশীতল	— তুষারের মতো ঠান্ডা।
স্যাঁতসেঁতে	— ভেজা ভাবযুক্ত।
অগ্নিপিণ্ড	— আগুনের গোলা।
জড়তা	— জড়ের ভাব, আড়ষ্টতা।
অকৃপণ	— কৃপণ নয় এমন। উদার।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মনে অবহেলিত, বঞ্চিত ও দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন ও আশ্রয়হীন মানুষের দুর্দশায় তারা ব্যথিত হবে।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রার্থী' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। আমাদের এই পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস সূর্য। সূর্য যে তাপ বিকিরণ করে তার সাহায্যেই ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের এই উত্তাপের জন্য সারারাত অপেক্ষা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। কবি সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি গভীর মমতা থেকে সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর প্রতি তাঁর অসীম মমতা। কবি এই শিশুদের কল্যাণে সূর্যের অবদান থেকে প্রেরণা নিতে চান। তিনি এমন সমাজ গড়তে চান, যেখানে বস্ত্রহীন শীতার্ত মানুষের জীবন থেকে সব দুঃখ চিরতরে ঘুচে যাবে।

কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সন্তান অল্প বয়সেই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। বামপন্থি-বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। বঞ্চনাকাতর মানুষের জীবন-যন্ত্রণার চিত্র যেমন তাঁর কবিতায় অঙ্কিত হয়েছে তেমনি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের সুরও উচ্চারিত হয়েছে। তিনি সেকালের দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কবিতায় মানবমুক্তির জয়গান বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম : 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'অভিযান', 'হরতাল' ও 'গীতিগুচ্ছ'। সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. 'সামাজিক বৈষম্য জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা' – এই মতের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের আয়োজন করো (দলগত কাজ)।

খ. গত সপ্তাহে কে, কী ধরনের ভাল কাজ করেছে, এর একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো (একক কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মারা যান?

ক. ২১ খ. ২২
গ. ২৩ ঘ. ২৫

২. সকালের এক টুকরো রোদকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক. কৃষকের চঞ্চল চোখ খ. এক টুকরো সোনা
গ. এক টুকরো গরম কাপড় ঘ. এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড

৩. সূর্যের কাছে রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটার জন্য উত্তাপ চাওয়ার মধ্যে কবির যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

i. সহযোগিতা
ii. সহমর্মিতা
iii. সহনশীলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

লিয়াকতের বাবা অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সেই থেকে সে প্রচণ্ড শোক বুকে নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় করে কিছু টাকা। আর সে টাকা দিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে গড়ে তোলে একটি হাসপাতাল; যাতে কোনো অসহায়, দুঃস্থ মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়।

৪. লিয়াকতের কার্যক্রমে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা হলো—

i. মহানুভবতা
ii. মানবতা
iii. মমত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

৫. 'প্রার্থী' কবিতায় কবি সুকান্তের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড হওয়া আর উদ্দীপকে লিয়াকতের শোকগ্রস্ত হওয়া আসলে—

i. আর্ত-মানবতার কল্যাণ করা

ii. কল্যাণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হওয়া

iii. মানুষ মানুষের জন্য—এ সত্যে উন্মুখ হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii   খ. i ও iii

গ. ii ও iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নাদিম সাহেব দামি গাড়ি হাঁকিয়ে অফিসে যাবার পথে রাস্তার সিগন্যালে অপেক্ষা করছিলেন। জীর্ণ-শীর্ণ এক ভিক্ষুক তাঁর গাড়ির জানালার পাশে ভিক্ষার থালা বাড়িয়ে দিলে তিনি জানালার কালো গ্লাস তুলে দেন। আর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ভিক্ষুকে দেশটা ভরে গেছে। কথা শুনে ড্রাইভার মহসীন বলে— স্যার, গরিব মানুষ, কী করবে বলেন? এই ভিক্ষার আয় রোজগার দিয়েই তো ওরা সংসার চালায়।

ক. 'প্রার্থী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

খ. কবি সূর্যকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের নাদিম সাহেবের আচরণ 'প্রার্থী' কবিতার কোন ভাবের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ?— বর্ণনা করো।

ঘ. ড্রাইভার মহসীনের অভিব্যক্তিতে 'প্রার্থী' কবিতার মূল চেতনা প্রকাশ পেলেও কবি সুকান্তের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

২. 'দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কী জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?'

ক. 'হিমশীতল' অর্থ কী?

খ. আমাদের গরম কাপড়ের অভাব কীভাবে দূর হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

গ. কবিতাংশের প্রথম তিনচরণে 'প্রার্থী' কবিতার যে দিকটির সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তার বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের শেষ চরণের বক্তব্যে 'প্রার্থী' কবিতায় কবির অভিমতের প্রতিফলন ঘটেছে কী? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।

একুশের গান

আবদুল গাফফার চৌধুরী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখিরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না, খুন-রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;

পথে পথে ফোটে রজনিগন্ধা অলকানন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥

সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর-ছেলে বীর-নারী
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

শব্দার্থ ও টীকা

রক্তে রাঙানো — বহু মানুষের আত্মোৎসর্গে সিক্ত বা উজ্জ্বল।
অশ্রু-গড়া — চোখের পানিতে নির্মিত।
বসুন্ধরা — পৃথিবী।
ক্রান্তি — পরিবর্তন।
লগন — লগ্ন, উপযুক্ত বা শুভ সময়।
অলকানন্দা — একটি ফুলের নাম।
ওরা গুলি ছোড়ে — এখানে পাকিস্তানি পুলিশকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর তারা গুলি ছুঁড়েছিল।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা-আন্দোলনে বাঙালির আত্মত্যাগ নিয়ে একদিকে গর্ব করতে শিখবে, অন্যদিকে তারা শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করার জন্য সব ধরনের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনে 'একুশের গান' প্রথম ছাপা হয়। এখানে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভাষা-আন্দোলনে বাঙালি ছাত্র-জনতার আত্মোৎসর্গকে স্মরণ করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের রক্তদান কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। এখানে অন্যায়ভাবে গুলিবর্ষণকারী তৎকালীন পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির জাগ্রত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে।

কবি-পরিচিতি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী কথাশিল্পী, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট হিসেবে খ্যাতিমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। সমাজমনস্ক লেখক হিসেবে ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২) ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) চলাকালে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ গ্রন্থ হলো 'ডানপিটে শওকত', 'আঁধার কুঠির ছেলেটি' ইত্যাদি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, ইউনেস্কো পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে মে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

কর্ম-অনুশীলন

ক. একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি দাওয়াতপত্র তৈরি করো (একক কাজ)।

খ. একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ করে তোমাদের লেখা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ নিয়ে একটি দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করো (দলগত কাজ)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে'— এখানে কোন শহিদের কথা বলা হয়েছে?

ক. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের	খ. বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের
গ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের	ঘ. নব্বইয়ের গণআন্দোলনের

কবিতাংশটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

'আমার বৃদ্ধ পিতার শরীরে
এখন পশুদের প্রহারের
চিহ্ন;'

২. কবিতাংশের ভাবের সাথে নিচের কোন লাইনটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
- ক. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
- খ. দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি
- গ. দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
- ঘ. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত পশুদের ন্যায় 'একুশের গান' কবিতায় পশু হচ্ছে–
- i. ওরা এদেশের নয়— চরণের 'ওরা'
- ii. দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি? —চরণের 'তোরা'
- iii. তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি — চরণের 'তুমি'

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. 'ঝড়ের রাত্রে, বৈশাখী দিনে, বরষার দুর্দিনে
অভিযাত্রিক, নির্ভীক তারা পথ লয় ঠিক চিনে।
হয়তো বা ভুল, তবু ভয় নাই, তরুণের তাজা প্রাণ
পথ হারালেও হার মানে নাকো, করে চলে সন্ধান
অন্য পথের, মুক্ত পথের, সন্ধানী আলো জ্বলে
বিনিদ্র আঁখি তারকার সম, পথে পথে তারা চলে।'

২. 'ওরা কেড়ে নিতে চায় বুকের স্বপ্ন, মায়ের মুখের ভাষা
ঝরিয়ে রক্ত, ভাইয়ের প্রাণ, হৃদয়ের ভালোবাসা।
জেগে উঠো আজ সাহসী যৌবন, আনো নব উত্থান
দ্রোহের আগুনে পোড়াও ওদের, গাও বিজয় গান।'

ক. 'একুশের গান' কবিতাটি কোন শহিদের স্মরণে লেখা হয়েছে?
খ. 'সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা'—চরণটি ব্যাখ্যা করো।
গ. দ্বিতীয় উদ্দীপকের আলোকে 'একুশের গান' কবিতায় বর্ণিত 'ওরা এদেশের নয়'– চরণটি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. প্রথম উদ্দীপকের যিনি অভিযাত্রিক তিনিই 'একুশের গান' কবিতার ভাষা-শহিদ –বিশ্লেষণ করো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম : সাহিত্য-কণিকা

পরনিন্দা ভালো নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।